জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

এতে সময়ের মূল্য, জীবনের গুরুত্ব, মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান-সাধনা উচ্চ মনোবৃত্তি, শিক্ষাজীবনে একাগ্রতা, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি বিষয় আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে

মূল

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ ওমর ফারুক

জামি'আ মাজাহেরুল উলূম, বোর্ডবাজার, গাজীপুর

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
....
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

খেলায় মজিয়া শিশু কাটাইও না বেলা
সময়ের প্রতি কভু করিওনা হেলা।
আজি যে সময় গত হইল তোমার
আসিবেনা পুণঃ তাহা আসিবেনা আর।
তাই বলি বৃথা কাল করিওনা ক্ষয়
আপন কাজ কর থাকিতে সময়।

(সংগৃহিত)

অনুবাদকের আরয

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে আমাদেরকে যত নেয়ামত দান করেছেন 'সময়' তার অন্যতম। যার কোন জুড়ি হতে পারে না। এ 'সময়'ই উন্নতি-অবনতির সোপান। এখানে যাদের পদস্খলন ঘটেছে তারা আর শির উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারেনি।

'সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না'। এ প্রবাদটি আজ বিশ্ব মানবের সামনে দিবালোকের ন্যায় ভাস্বর। যারা সময় কাজে লাগিয়েছেন তারাই হয়েছেন জগতের শ্রেষ্ঠ উপহার। হয়েছেন হীরক খন্ড। স্থান পেয়েছেন ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে। পক্ষান্তরে যারা সময় কে হেলায়-খেলায় ও ক্রীড়া-কৌতুকে কাটিয়েছে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তা কুঁড়ে। পরিণত হয়েছে জাতির ক্যান্সারে। তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়েছে তাদেরকে অধঃগতি, অবক্ষয়, লাঞ্ছনা ও জাতির ভর্ৎসনা। তাদের গ্রীবাদেশে চেপে বসেছে গোলামীর জিঞ্জির। এটাই ইতিহাসের দেদীপ্যমান শিক্ষা।

আজ ক্রিকেটের নামে এবং স্যাটেলাইটের নেপথ্যে রক্ত পিপাসু এক হিংস্র দানব জাতির ঘাঁড়ে চেপে বসেছে। তার নগ্ন থাবার কাতর শিকার মুসলিম বিশ্বের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সবার জীবনী শক্তি মূল্যবান 'সময়'। আমাদেরকে টিভির সামনে বসিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য জগৎ আজ 'ল্যাবরেটরি'তে বসে গবেষণা করছে। আমাদেরকে ষ্টেডিয়ামে পাঠিয়ে দিয়ে তারা আজ মহাকাশে বিচরণ করছে। আমাদের হাতে খেলার সামগ্রী তুলে দিয়ে তারা আজ উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির চাবি কাঠি হাতে নিয়েছে। এ কি আদৌ কাম্য ? কখনো মেনে নেয়ার মত ?

সময়ের মূল্যায়ন শুধু সুবুদ্ধির পরিচায়কই নয়, এটি ধর্মীয় কর্তব্য ও বটে। ইতিহাস সাক্ষী, মুসলমানরা যতদিন এ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট ছিল

ততদিন তারা ইতিহাসের স্বর্ণোজ্জল অধ্যায় রচনা করতে পেরেছিল। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস! আজ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আজ আমরা আল্লাহর দেয়া এ মহা মূল্যবান নেয়ামত অনর্থক ব্যয় করে চলছি। তাই আজ আমরা শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য এক কথায় সর্ব দিকেই পশ্চাৎপদতার শিকার।

'সময়' অপচয়ের এ গ্রাসী ঝড় থেকে দিশেহারা জাতিকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নিতে দীর্ঘ দিন ধরে আমার ব্যথিত হৃদয় ছট-ফট করছিল। আল্লাহর অপার অনুগ্রহ– কিছু দিন পূর্বে পাকিস্তানের ইসলামী শরীয়া বোর্ডের চীপ জাষ্টিস আল্লামা ত্বকী উসমানী (দাঃ বাঃ)-এর ধারাবাহিক বয়ান "ইসলাহী খুতূবাত"-এর ৩৭ তম সিরিজ 'ওয়াক্ত কি ক্বদর করে' আমর দৃষ্টি গোচর হয়। তখন আমি এর অনুবাদের মাধ্যমে আমার সেই দীর্ঘ দিনের মর্ম জ্বালার উপশম করতে চেষ্টা করি।

মূল বইটির পরিসরের স্বল্পতার দরুন একই বিষয়ের উপর লেখা আরবী, উর্দু বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বিশেষ করে আল্লামা ত্বকী উসমানীর (দাঃ বাঃ) উস্তাদ আল্লামা আব্দুল ফাত্তাহ আবু গাদ্দাহ (রঃ) রচিত 'ক্বিমাতুজ্জামান ইন্দাল উলামা' থেকে কিছু অংশ এখানে সংযোজন করার মনস্থ করেছি।

যুগের এই সন্ধিক্ষণে উদাসীনতার ভেলায় ভাসমান জাতির দু' চার জনও যদি এই বইটি পাঠে সময়ের মূল্য সম্পর্কে সামান্যতম চেতনা ফিরে পায় তবে আমাদের এই শ্রম সার্থক মনে করবো।

অনুবাদ, সম্পাদনা, প্রুফ দেখা ও প্রকাশনায় যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে পরম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি এবং আল্লাহর দরবারে তাদের উত্তম প্রতিদান কামনা করছি।

মানুষ মাত্রই ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সুধী মহলের সতর্ক দৃষ্টি যদি কোথাও হোঁচট খায় তাহলে সংশোধনের নিয়তে জানিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

তারিখ
১৫ই রজব ১৪২১ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মদ ওমর ফারুক

বিন্যাস ধারা

বিষয়	পৃষ্ঠা

মানুষের প্রতি দু'টি অমূল্য নেয়ামত

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله - صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً - اما بعد !

عن ابن عباس رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ (البخارى)

অর্থ ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে দেয়া এমন দু'টি নেয়ামত রয়েছে, যার প্রতি অধিকাংশ মানুষই উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তার একটি হল, সুস্থতা আর অপরটি, অবসরতা বা কর্ম শূণ্যতা।

আল্লাহ প্রদত্ত এ দু'টি নেয়ামত এমন যে, যখনই এর কোনটি বা উভয়টিই কারো হাতের নাগালে আসে তখনই সে শয়তান বা কু প্রবৃত্তির গ্রাসী থাবার শিকার হয়ে ভাবতে থাকে যে, এ নেয়ামতটি তার কাছে আজীবন থাকবে। যেমন ঃ যখন কেউ শারীরিক ভাবে সুস্থ থাকে, তখন সে একটি বারের জন্যও এ কথা ভাবে না বা ভাবার চেষ্টাও করে না যে, হয়তো এক মুহুর্ত পরেই সে অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। এমনি ভাবে যখন কারো কোন অবসর সময় আসে তখন সে ভাবতেও পারে না যে, হয়তো ক্ষণিক পরই তাকে ব্যস্ততা এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরবে যে, সে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে অথচ পানাহারেরও ফুরসত পাবে না।

অবসরের ব্যাপারে মানুষের সিকি ভাগের চেয়ে কম হলেও চেতনা আছে। কিন্তু সুস্থতার মূল্যায়নের প্রতি উদাসীনতার হার একেবারে এক শ' ভাগের এক শ' ভাগই বললেও মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। অথচ কারো কি এটা জানা আছে যে, সে কতদিন সুস্থ থাকবে ? কখন অসুস্থ

হয়ে পড়বে ? এবং কি ধরণের বিপদের সম্মুখীন হবে ? কত সুস্থ-সবল যুবক হঠাৎ এমন জটিল অসুস্থতার জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে যে, আর চলা-ফেরা করার শক্তিটুকুও পাচ্ছে না।

তাই যখনি আল্লাহ্ তায়ালা সুস্থতা বা অবসর দান করেন তখনি প্রতারিত না হয়ে টাল বাহানা নীতি পরিহার করে মূল্যবান সময় কাজে লাগানো উচিৎ। ভাল কাজ, নেক আমল, আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ এবং আখেরাতের চিন্তা ভাবনা করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। কারণ এ সুযোগ পূণরায় আসবে কিনা এটা কারো জানা নেই। কেউ যদি এ কথা মনে করে যে, এখনো বহু সময় আছে। এখন চিত্ত বিনোদন, মনোরঞ্জন ও আমোদ-প্রমোদ করে নেই। পরে সময় এলে নেক আমল করবো, নামায-রোযা করবো, দাড়ি রাখবো, তাব্লীগ বা কোন পীরের কাছে গিয়ে আল্লাহ্ ওয়ালা হয়ে যাবো; তাহলে তার কাছে আমার জিজ্ঞাসা তার সাথে কি হযরত আয্রাঈলের (আঃ) কোন গোপন চুক্তি হয়েছে ? এ ধরণের মনোভাব পোষণকারীদের অনেকেই পরে শুধুই আফসোস, পরিতাপ ও অনুতাপ করেই জীবন শেষ করে। সুস্থতাও ফিরে পায় না। আর ইবাদত করার সামর্থ্যও হয় না। আর যারা সুস্থতার পোষাক নিয়েই হঠাৎ করে পরপারে যাত্রা শুরু করে তাদের তো এ অনুতাপটুকুও করার অবকাশ থাকে না। যেন পৃথিবীর ইতিহাসে সে-ই বড় হতভাগা। তাই নবীজীর (স.) সেই বাণী জাতির জন্য কতটুকু হিতোপদেশ তা বিবেচনার করার এখনো সময় আছে। তিনি বলেছেন– বিপদ সঙ্কুল পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই তার যথার্থ মূল্যায়ন কর– (১) বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে যৌবন (২) অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতা (৩) দারিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলতা (৪) ব্যস্ততার পূর্বে অবসরতা এবং (৫) মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে মূল্যায়ন কর। (তিরমিযী)

কোরআনে কারীমেও এ ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। বিবৃত হয়েছে যে, পার্থিব জীবনকে যারা হেলায়, বিনোদন, আনন্দ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে রিক্ত হস্তে আল্লাহ্র দরবারে

উপস্থিত হবে তারাই হিসাব-নিকাশের সেই ভয়াবহ মুহূর্তে আর্তচিৎকার করে বলবে– প্রভু হে! আমাদেরকে আর মাত্র একটি বারের জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়ে দাও। আমরা সৎ কাজ ও নেক আমল করে আসব । পূর্বে যা করেছি তা আর কখনও করবো না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এতটা সময় দেইনি; যাতে তোমরা যা চিন্তা করার করতে পারতে ? অধিকন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারী (নবী-রাসূল, আলেম-ওলামা, ধর্মীয় বই-পুস্তক ও দ্বীন প্রচারকারীগণ) ও আগমন করছে। (৩৫ঃ৩৭) তাই সুধী মহলের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ এখনো সময় আছে। সময়কে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হোন।

আমাদের পর্থিব জীবন যে খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং বরফ খন্ডের ন্যায় দ্রাবমান। এ কথা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অনুধাবন করতে পারে। এর জন্য কোন বার্তা বাহক বা কোন ভীতি প্রদর্শনকারীর আদৌ প্রয়োজন হয় না। তুবও পরম দয়ালু মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তাঁদের সে সতর্ককরণের পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের জীবন নিয়ে একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা আরো অনেক বিদায়ীবার্তা এবং সতর্ক সংকেত খুঁজে পাবো। দেখা যাক তাহলে–

আজরাঈল (আঃ)এর সাথে কথোপকথন

লিখক আল্লামা তাকী উসমানীর ভাষ্য—আমি আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)এর নিকট একটি ঘটনা শুনেছি। তিনি বলেন, হযরত আজরাঈল (আঃ)এর সঙ্গে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হল। সে আজরাঈল (আঃ)কে অভিযোগের সুরে বলল, আপনার ব্যবহারটা কেমন আশ্চর্যজনক! দুনিয়াতে কাউকে যদি গ্রেফতার করতে হয়, তাহলে দুনিয়ার আদালতে তার কানুন হল গ্রেফতারের পূর্বে তাকে নোটিশ দেয়া হয় যে, তোমার বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়েছে। তুমি এর জন্য প্রস্তুত থেকো। পক্ষান্তরে আপনার যখন ইচ্ছে বিনা নোটিশে গ্রেফতার

করে নিয়ে যান। এটা কেমন কথা? উত্তরে হযরত আজরাঈল (আঃ) বললেন, ওহে! দুনিয়ার আদালত তো মাত্র একটি নোটিশ দিয়ে থাকে। আর সে একটাই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অথচ আমি যে একাধিক নোটিশ দিতে থাকি সেটা কি আদৌ তোমার দৃষ্টি গোচর হয় না ? দুঃখের বিষয় হল তোমরা সর্বদাই এ ব্যাপারে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করে থাক। কি হে! তোমার দেহে জ্বর হওয়া কি আমার পক্ষ থেকে নোটিশ নয় ? তোমার ব্যাধি গ্রস্থতা কি আমার পক্ষ থেকে নোটিশ নয় ? তোমার দাড়ি সাদা হওয়া কি আমার পক্ষ থেকে নোটিশ নয় ? তোমার ছেলে-মেয়ের ঘরে নাতি-নাতনী জন্ম নেয়া কি আমার পক্ষ থেকে নোটিশ নয় ? এ ভাবে ক্রমান্বয়ে আমি বহু নোটিশ প্রেরণ করতে থাকি । কিন্তু তোমরা সে দিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করনা। তাইতো নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সেই আফ্‌সোস ও অনুতাপের মুহূর্ত আসার পূর্বেই নিজেকে শামলিয়ে নাও। জীবনের সুস্থতা ও অবসর সময় কাজে লাগিয়ে নাও। আল্লাহই ভাল জানেন এ জীবনের আগামি কাল বলতে কিছু তুমি পাবে কিনা !

দু'রাকাত নামাযের জন্য অনুতাপ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি কবর তাঁর দৃষ্টি গোচর হল। তিনি সেখানে যাত্রা বিরতি করে সাওয়ারী থেকে অবতরণ করে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। তাঁর সঙ্গীরা ভাবলেন, এখানে হয়তো কোন বিশেষ ব্যক্তির কবর হবে। তাই তারাও সাওয়ারী হতে নেমে হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) অনুকরণে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে সবাই পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। ভ্রমনের এক পর্যায়ে সঙ্গীদের একজন অদম্য কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আপনি সেখানে যাত্রা বিরতি করে নামায আদায় করলেন কেন ? এর রহস্য কি ? তিনি বললেন, ব্যাপার হল আমি যখন ঐ কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম তখন আমার হৃদয়ে ভাবনার উদ্রেক হল যে, যারা দুনিয়া ত্যাগ

করে কবর জগতে অবস্থান করছেন তাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তারা শত চেষ্টা করলেও আমল করতে পারবে না, আর কেউ আল্লাহর বিশেষ কৃপায় কোন আমল করলেও তার কোন সাওয়াব লেখা হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, এ লোকগুলো (কবর বাসীরা) কবরে থেকে এ আকাংখা করতে থাকবে যে, হায়! যদি আমরা আরো এতটুকু সময় পেতাম যাতে আরো দু'রাকাত নফল নামায পড়া যায়; তাহলে আমাদের নেক আমলের দপ্তরে আরো দু'রাকাত নামাযের সাওয়াব যোগ হয়ে যেত। কিন্তু তাদের এ আকাংখা ও অনুতাপ সত্ত্বেও নামায পড়ার সুযোগ তাদের আর আসবে না। তাই আমি ভাবলাম, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে যে সুযোগ দান করেছেন সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে দু'রাকাত নামায পড়ে নেই।

সার কথা, আল্লাহ্ তায়ালা যাদেরকে এ ধরণের চিন্তা-চেতনা দান করেছেন তাদের জীবনটাই বিচিত্রময়। তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এভাবেই কাজে লাগিয়ে থাকেন।

ক্ষেতে ফসল ফলাতে কার্পণ্য করো না

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন "দুনিয়া হল আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ"। অর্থাৎ ক্ষেতে বা জমিনে যে বীজই বোপন করবে সে চারাই অঙ্কুরিত হবে। কেউ নেক আমলের বীজ বোপন করলে তার জন্য ফলের বৃক্ষ অঙ্কুরিত হবে। ছায়াদার বৃক্ষ জন্ম নিবে। আর সেটি একদিন বিশাল মহীরুহে পর্যবসিত হয়ে তাকে উপকৃত করবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি পাপাচারের বীজ ছিটায়। তাহলে সেখান থেকে জন্ম নিবে কন্টকাকীর্ণ বিষ বৃক্ষ। যা তার ইহ ও পারলৌকিক জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিবে। তাই যা করার তা এখনই করতে হবে। উপরন্তু এর ফলাফল ও দিবাকরের ন্যায় প্রতিভাত। আর কোন সচেতন, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি দেখে শুনে আদৌ কন্টকাকীর্ণ ও কর্দমাক্ত পথে পা বাড়াতে পারে না।

হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ)-এর সময়ের গুরুত্ব

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) উচ্চ পর্যায়ের একজন মুহাদ্দিস। যিনি বুখারী শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ "ফাত্হুল বারী" প্রনেতা। আমলের যে উচ্চ শিখরে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছেন আজকের মানুষ তার কল্পনাও করতে পারে না। তাঁর দীপ্ত জীবনী সাক্ষ্য, তিনি একজন খ্যাতমান লেখক ছিলেন। লেখতে লেখতে যখন কলমের নিব নষ্ট হয়ে যেত (আধুনিক যুগের কলম নয়। সে কালের বাঁশের কলম) তখন তিনি নিজেই চাকু দিয়ে নিব তৈরী করতেন। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে, নিব তৈরীর এ সামান্য সময় টুকুও তিনি আল্লাহর ইবাদতশূণ্য ছেড়ে দিতেন না। নিব তৈরীর পাশাপাশি তিনি আল্লাহর যিকির করতেন,-"সুব্হানাল্লাহ্' 'আল্ হামদু লিল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' এর যিকির এ সামান্য সময়ের জন্যও তার যবান থেকে দূরে থাকতো না। তিনি ভাবতেন, যে সময় টুকু তাস্নীফের কাজে ব্যয় হচ্ছে তা তো নির্ঘাত আল্লাহর ইবাদতেই ব্যয়িত হচ্ছে। কিন্তু যে সামান্য সময় নিব মেরামতে যাবে তা কেন ইবাদতহীন অতিক্রান্ত হবে ? তাই এ টুকু সময়কেও তিনি কাজে লাগাতেন।

হযরত মুফ্তী শফী (রহঃ)-এর সময়ের গুরুত্ব

আমাদের নিকট সব চেয়ে বেশী অমূল্য সম্পদ হওয়ার কথা ছিল সময়। কিন্তু আজ তা সব চেয়ে বেশী উদাসীনতার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। যার যেভাবে ইচ্ছে সে ভাবেই সময় ব্যয় করছে। কেউ ষ্টেডিয়ামের গ্যালারীতে বসে, কেউ টেলিভিশন, সিনেমার পর্দার সামনে বসে, কেউ চা দোকানে বা বাড়িতে গল্প-গুজবে এই মহা মূল্যবান সময়কে অবলীলাক্রমে কাটিয়ে দিচ্ছে। এতে কারো বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা হচ্ছেনা। এই কাল ক্ষেপণে না তাদের দুনিয়ার কোন ফায়দা হচ্ছে আর না আখেরাতের। আমার পিতা হযরত মুফ্তী শফী (রহঃ)

প্রায় বলতেন, আমি আমার সময় মেপে মেপে খরচ করি যেন কোন একটি মুহুর্তও অযথা ব্যয় না হয়। হয়ত তা দ্বীনের কাজে ব্যয় হবে নয়ত দুনিয়াবী কাজে। আর দুনিয়ার কাজেও যদি নিয়্যাত সঠিক হয় তাহলে সেটাও আখেরাতের কাজে পরিণত হয়ে যায়।

তিনি তাঁর শাগরেদদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, একটি লজ্জার কথা, শুধু তোমাদের বুঝানোর জন্য বলছি, মানুষ যে সময়টা টয়লেটে কাটায় সে সময়টা এমন যাতে না পারে আল্লাহর যিকির করতে, (কেননা তখন যিকির করা শরীয়তে নিষেধ) আর না পারে অন্য কোন কাজ করতে। তাই আমার এ সময়টা এক দুঃসহ মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সে জন্য আমি এথেকে উত্তরণের একটি পথ খুঁজে বের করেছি– টয়লেটে থাকা কালীন আমি বসে বসে টয়লেটের লোটা-বদনা পরিস্কার করতে থাকি। যাতে আমার এ সময়টাও বেকার নষ্ট না হয়। উপরন্তু আমার পরে যে ব্যক্তি টয়লেটে আসবে সে যেন এতে আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং এটি ব্যবহারে কোন রকম সংকোচের শিকার না হয়।

তিনি বলতেন, আমি পূর্ব থেকেই ঠিক করে রাখতাম যে, অমুক দিন অমুক সময় আমি পাঁচ মিনিট সময় অবসর পাব। তা আমি এই ভাবে কাজে লাগাবো। পানাহারের অব্যবহিত পর সাধারণত কোন কাজ বা পড়া-লেখায় লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নয়। তাই তখন কিছু সময় অধ্যাপনা বা অন্য কোন কাজের বিরতি থাকতো বটে, কিন্তু সে সময়টাও আমার একেবারে কর্ম শূণ্য কাটতো না। সে সময় আমি পূর্ব নির্ধারিত কোন কাজ সম্পাদন করতাম। যারা আমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তারা হয়তো দেখেছেন যে, তিনি 'কারে' সফর করতেন। আর সফর কালেও তাঁর কলম বিরত থাকত না। আমি তো তাঁকে রিক্সায় বসেও লিখতে দেখেছি, অথচ রিক্সায় বসে সাধারণত লেখা সম্ভব নয়। কারণ রিক্সার ঝাঁকুনিতে লেখা এবড়ো থেবড়ো হয়ে যায়।

পিতা মুফ্‌তী শফী (রহঃ) এ ব্যাপারে অত্যন্ত মূল্যবান একটি বাণী রেখেছেন। যা সবার স্মরণ রাখার মত। তিনি বলেছেন, যে কাজ সুযোগ ও অবসরের অপেক্ষায় রেখে দেয়া হয় তা থেকেই যায়। সে কাজ আর সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। কারণ, মানুষের একটি কাজ শেষ হতে না হতেই আরেকটি এসে উপস্থিত হয়, আর ব্যস্ততা মানুষকে এভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে যে, তা থেকে ছুটে এসে রেখে দেয়া কাজটি সম্পাদন করা আর সম্ভব হয় না। তাই প্রতিটি কাজই নগদ নগদ করাই শ্রেয় এবং বিজ্ঞজনোচিৎ। তিনি বলেন, কাজ করার পদ্ধতি হল, দু'টি কাজের মাঝে জোর পূর্বক আরেকটি কাজ ঢুকিয়ে দাও। দেখবে, সে কাজটিও হয়ে গেছে।

'নফ্‌স ' কি তবুও অলসতা করবে ?

আমাদের শায়েখ ডাঃ আব্দুল হাই (রঃ) বলতেন, সময়কে কাজে লাগানোর পদ্ধতি শিখে নাও। ধর, তোমাদের মনে এ খেয়াল আসলো যে, অমুক সময় তেলাওয়াত করবো, নফল নামায বা কোন নেক আমাল করবো। এরপর যখন সে সময় এসে গেল ; তখন মানসিক অলসতা শুরু হল। মন সে দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছে না। এমন সময় নফ্‌সকে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে দাও। নফ্‌স্‌কে বল, আচ্ছা এখন তোমার অলসতাবোধ হচ্ছে। বিছানা থেকে উঠতে চাচ্ছো না। কিন্তু যদি এখন রাষ্ট্র প্রধানের পক্ষ থেকে তোমার নিকট এ পয়গাম আসে যে, তোমাকে আকর্ষণীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হবে বা উচ্চ পদস্থ কোন চাকরি দেয়া হবে। তুমি এক্ষুণি আমার নিকটে এসে পড়। বল, তখন তোমার অলসতা থাকবে ? তুমি কি সেই মোক্ষম সুযোগ হারাবে ? তুকি কি এ উত্তর দিবে যে, আমি এখন আসতে পারবো না ? এখন আমার নিদ্রা আসছে ! যার কাছে সামান্যতমও জ্ঞান রয়েছে বাদশার পয়গামে তার সকল আলস্য ও নিদ্রা বিদূরিত হয়ে যাবে। হর্ষধ্বনি দিয়ে সে এনাম লাভের লক্ষ্যে সামনে এগুবে আর বলবে, 'এত বড় সুযোগ হাত ছাড়া করা যায় না।'

এবার একটু ভেবে দেখ, দুনিয়ার একজন সাধারণ ক্ষমতাসীন, যে আল্লাহর সামনে কিছুই না। একেবারে নগণ্য, অক্ষম ও অপারগ। সে তোমাকে দুনিয়ার একটি পদের জন্য ডাকলে তুমি তার ডাকে সাড়া দিতে এত আগ্রহী ! অথচ মহান আহকামুল হাকেমীন আল্লাহর পক্ষ হতে তোমার প্রতি আহ্বান আসছে, আর তুমি তার আহ্বানে সাড়া দিতে অবহেলা ও অলসতা করছো ! একি আদৌ সমীচীন ?

কু প্রবৃত্তির খপ্পর থেকে মুক্তির উপায়

মানুষের অন্তর মাত্রই পাপ কল্পনা আসতে পারে। এটা অন্যায় নয়। কিন্তু এ কল্পনা লালন করাই বড় অন্যায়। আর পৃথিবীর অপরাধ জগতের সিংহ ভাগই এই উৎস থেকে উৎসারিত। তাই কল্পনা আসা মাত্রই তা থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে হবে। অন্তর থেকে মুছে ফেলতে হবে তার ছাপশুদ্ধ। আমাদের শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী ডাঃ আব্দুল হাই (রঃ) এই পাপ কল্পনা থেকে উত্তরণের একটি পথ বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মনোরাজ্যে যখন গুনাহের কাজ করার কল্পনা আসে তখন আল্লাহকে স্মরণের মাধ্যমে তাকে তাড়িয়ে দাও। যদি এতে সেই কল্পনা তাড়িত না হয় বরং ক্রমশঃ ঝড়ো হাওয়ার রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে, তাহলে চক্ষু বন্ধ করে কিছুক্ষণ তোমার পারিবারিক ও সামাজিক পরিমন্ডলে বিচরণ কর। মনকে জিজ্ঞেস কর– যদি এখন আমার পিতা-মাতা আমার সামনে থাকেন তাহলে কি আমি তাদের সামনে এ ধরণের গর্হিত কাজে লিপ্ত হতে পারবো ? যদি আমার উস্তাদ আমার সামনে থাকেন তাহলে কি আমি তাঁর সামনে এ ধরণের কাজ করতে পারবো ? যদি এখন আমাদের সমাজপতি এখানে উপস্থিত থাকেন তাহলে কি আমি তার সামনে এ কাজে লিপ্ত হতে পারবো ? যদি একান্ত অবাধ্য হয়ে বা চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে এ কাজে জড়িয়েই পড়ি তাহলে তারা আমাকে কি ধরণের শাস্তি দিতে পারেন ? দেখবে, তখন অবশ্যই অবশ্যই মনো মুকুর থেকে কল্পনার দাগশুদ্ধ মুছে যাবে। তারপর চিন্তা কর–এরা দেখলে হয়তো

সাময়িক ভাবে আমাকে ভর্ৎসনা করবে। বড়জোর কিছু উত্তম-মধ্যমও দিবে। কিন্তু এরপর আর কোন খবরও থাকবেনা। অথচ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে যদি আমি এ কাজে লিপ্ত হই তাহলে কি তিনি আমাকে সাময়িক শাস্তি দিবেন, না চিরস্থায়ী ? আর সে শাস্তি কি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় পরিসরে সীমিত, না হযরত আদম থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের সামনে দেয়া হবে ? তিনি বলেন, আশা করা যায় যে, এ ভাবে চিন্তা করলে আল্লাহর রহমতে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যাবে।

পার্থিব জীবনের ভি. ডি. ও ক্যাসেট

শায়েখ ডাঃ আব্দুল হাই সাহেব (রঃ)- এর আরেকটি কথা স্মরণে পড়ে। তিনি বলতেন, এ বিষয়টি সামান্য একটু চিন্তা কর যে, আখেরাতে যদি আল্লাহ তায়ালা বলেন, আচ্ছা জাহান্নামে যেতে তো তোমার ভয় হচ্ছে। তবে ঠিক আছে এ শর্তে তোমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিতে পারি যে, তোমার পুরো জীবনের ভি. ডি. ও ক্যাসেট তোমার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, ছেলে-সন্তান, ছাত্র-উস্তাদ, বন্ধু-বান্ধব সকলের সামনে চালু করা হবে এবং এতে তোমার পুরো জীবনের চিত্র তুলে ধরা হবে! তুমি কি এতে রাজী ? তিনি বলেন, মানুষ আগুনের শাস্তিকে মাথা পেতে নিবে, তবুও এতে সম্মত হবে না। সুতরাং যেখানে নিজের মাতা-পিতা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন তথা মাখলুকের সামনে নিজের জীবনের চিত্র উপস্থাপন মনঃপূত নয়, সেখানে কি করে আল্লাহ তায়ালার সামনে জীবনের সকল অপকর্মের ঝুড়ি পেশ করতে রাজী হতে পারে ?

সৎকর্ম দ্রুত সম্পাদন কর

জাগতিক ক্রিয়া-কর্মে সাধারণতঃ দ্রুততা, ক্ষিপ্রতা ও তাড়াহুড়ো কোন প্রশংসার কাজ নয়। বরং অনেকের কাছেই এটি নিন্দাহ। কারণ,

এতে অনেক সময় লাঞ্ছনার শিকারও হতে হয়। উপরন্তু কোরআন হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। কিন্তু সৎকাজ ও পারলৌকিক বিষয়ে দ্রুততা ও শীঘ্রতা একদিকে যেমন প্রশংসনীয় অন্যদিকে তেমনি শরীয়তে এর প্রতি নির্দেশও রয়েছে। এরশাদ হচ্ছে–

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

অর্থ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে (দ্রুত) ছুটে যাও যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের (মধ্যবর্তী স্থান)। (৩ঃ১৩৩)

অন্যত্র অভিন্ন আদেশে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

অর্থ, তোমরা অগ্রে ধাবিত হও স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাতের দিকে যা আকাশ ও জমিনের মত প্রশস্ত (৫৭ ঃ ২১)

আলোচিত আয়াত দ্বয়ে যথাক্রমে مُسَارَعَةٌ এবং مُسَابَقَةٌ শব্দ দ্বয়ের অর্থ সৎ কাজে একে অপর থেকে আগে বেড়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করা, প্রতিযোগিতা করা। আর এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। অথচ আজ আমরা উদাসীনতার ভেলায় চড়ে অজানা গন্তব্যে ভেসে চলছি। কুরআনের নির্দেশ এবং হাদীসের সতর্ক বাণীর প্রতি আমাদের নাম মাত্রও ভ্রূক্ষেপ নেই। রাসূল (সঃ) বলেছেন–

عن عمربن ميمون الاودى رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك شغلك حيوتك قبل موتك – (ترمذى)

অর্থ, হযরত উমর ইবনে মাইমূনুল আদভী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) এক ব্যক্তিকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছেন, পাঁচটি অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে অপর পাঁচটি অবস্থাকে মূল্যায়ন কর। যৌবনকে বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার পূর্বে, ধনাঢ্যতাকে দারিদ্রতার পূর্বে, অবসরতাকে ব্যস্ততা আসার পূর্বে, এবং জীবনকে মৃত্যু আসার পূর্বে। (তিরমিযী)

যৌবন ঃ এ তো জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা যৌবন সম্পর্কে বিশেষ ভাবে হিসাব নিবেন। এ ধরণের গুরুত্ববহ একটি সময়কে আজ মানুষ হেলায় খেলায় নিঃশেষ করে দেয়। অথচ সবাই এটা বিলক্ষণ জানে যে, যৌবনের সীমানা পেরিয়ে বার্ধক্যে পদার্পণ করার গ্যারান্টি তাদের কাছে আদৌ নেই। আজকের টাগড়া যুবক কাল যে বার্ধক্যে বা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেনা এ ব্যাপারে কি কারো কোন নিশ্চয়তা আছে ? তাই বার্ধক্য আসার পূর্বে এ যৌবনকে গনীমত মনে কর। আল্লাহর দেয়া এই শক্তি, সামর্থ্য ও সুস্থতা কাজে লাগাও। আল্লামা শেখ সাদী (রহঃ) বলেন–

وقت پیر گرگ ظالم میشود پرهیزگاری

در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری

অর্থ, বার্ধক্যে তো জালিম হিংস্র প্রাণীও ফরহেজগার ও সংযমি হয়ে যায়। কারণ, তখন সে থাবা বিস্তার করে খেতে পারে না। তাই সে কার উপর হামলা করবে ? আর যৌবনে তাওবা করা নবীদের অভ্যাস।

সুস্থতা ঃ আজ সুস্থ আছ। কাল যে অসুস্থ হবে না এর কি কোন নিশ্চয়তা আছে ? মনে রেখো, পৃথিবীতে এমন কোন মানুষ নেই যাকে কখনো অসুস্থতা গ্রাস করেনি। অসুস্থতা নিশ্চয় আসবে। তবে কখন, কিভাবে, কোন খানে তা কারো জানা নেই। তাই সুস্থতাকে গনীমত মনে কর।

স্বচ্ছলতা ঃ আজ তোমার স্বচ্ছলতা আছে। হয়তো আরেক ধাপ এগিয়ে তুমি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ত। কিন্তু তোমার কি এটা জানা আছে যে, এ স্বচ্ছলতা বা ধনাঢ্যতার পরিধি কতটুকু ? এ ধরণের বহু লোক দেখেছি যাদের অবস্থা দিনাদিন পরিবর্তন হয়ে গেছে। বহু ধনীর দুলালরা দিবা-নিশির ঘূর্ণিপাকে পড়ে আজ ফকির। আল্লাহই ভাল জানেন, কখন কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সে মুহূর্ত আসার পূর্বেই মালদারীকে গনীমত মনে কর এবং টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ আখেরাতের জীবনকে সুসজ্জিত করার কাজে ব্যয় কর।

অবসর ঃ নিজের অবসর সময়কে গনীমত মনে কর। এটা আল্লাহ তায়ালার বিশেষ দান। এটা সর্বদা বিদ্যমান থাকে না। বরং এক সময় এমন ব্যস্ততা এসে যায় যে, নিঃশ্বাস ফেলারও ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই অবসর সময়কে কাজে লাগাও। পরিশেষে এ কথা সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, কোন মানুষই অমর নয়। মৃত্যু আসবেই। আর মৃত্যুর সাথে সাথেই ভাল-মন্দ সব ক্রিয়া কর্মই বন্ধ হয়ে যায়। তাই মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনকে মূল্যায়ন কর।

প্রভাতের প্রার্থনা

প্রতিটি কাজের শুরুতে যেভাবে একটি পরিকল্পনা, নক্শা বা একটি চক করে নিতে হয় ঠিক একই ভাবে একটি দিন অতিবাহনের জন্যও একটি চক থাকতে হয়। তাই সকাল বেলা ফজরের নামাজ পড়ে এ দোয়া করবে, হে আল্লাহ! এ দিনটিতে আমি স্বীয় কর্মে লিপ্ত হব। তুমি জান, আমি কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। সম্ভাব্য সকল-বিপদ থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো। হে প্রভু ! আমি আমার আজকের দিনকে আখেরাতের জন্য পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। তুমি আমাকে তা করার তাওফিক দাও। হুজুর (সঃ) সকাল বেলা যে দোয়াগুলো করতেন সে গুলো আমাদেরকেও মুখস্থ করে নেয়া উচিৎ। সকাল বেলা হুজুর (সঃ) এভাবে দোয়া করতেন –

(١) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ مَافِیْ هٰذَا الْیَوْمِ وَخَیْرَ مَا بَعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَافِیْ هٰذَا الْیَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهٗ (ترمذی)

(٢) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَیْرَ هٰذَا الْیَوْمِ وَفَتْحَهٗ وَنَصْرَهٗ وَنُوْرَهٗ وَبَرَكَتَهٗ وَهُدَاهُ (ابوداود)

হুজুর (সঃ) এমন এমন দোয়া করে গেছেন যাতে তিনি দ্বীন ও দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের কথাই বাদ দেননি। তিনি শুধু দোয়া করেই ক্ষান্ত হননি। উপরন্তু উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য এটাও বলেছেন, হে প্রভু! আমার এ সংকল্পের কি মূল্য আছে ? আমার হিম্মত ও সাহসের কি বাস্তবতা আছে ? সঠিক পথে ও সংকল্প অনুযায়ী পরিচালনাকারী তো আপনিই। আপনি স্বীয় মেহেরবানি দ্বারা আমাকে সে পথে পরিচালিত করুন। আপনি আমার মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দিন যেন এ দিনের চব্বিশটি ঘন্টা আপনার সন্তুষ্টি মাফিক ব্যয় করতে পারি। এভাবে দোয়া করলে এর বরকতে আল্লাহ তায়ালা দিনের সময়গুলোকে অযথা ব্যয় হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেবেন ইন্‌শা আল্লাহ।

সময় সোনা-রূপা হতে বেশী মূল্যবান

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মুবারক (রঃ) হযরত হাসান বসরীর* (রঃ) একটি বাণী উল্লেখ করেন, হযরত হাসান বসীর বলেন,

'আমি এমন লোকদের* পেয়েছি এবং সংশ্রবে থেকেছি যাঁরা স্বীয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সোনা-রূপার চেয়েও বেশী মূল্যবান মনে করতেন। মানুষ যে ভাবে সোনা-রূপাকে বড়ই হিফাযতে রাখে যাতে

টীকা

* হযরত হাসান বসরী (রঃ) উচ্চ পর্যায়ের তাবেঈনদের অন্যতম। আমাদের মাশায়েখ ও তরিকাতের যত সিল্‌সিলা আছে সব ক'টিরই প্রান্ত সীমা তিনিই। অর্থাৎ রাসূল (সাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ)-এর পরই হযরত হাসান বসরী (রঃ)। আমরা সবাই তাঁর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ। আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালা যা কিছু দান করেছেন তা এ সমস্ত বুযুর্গদের বরকেতই।

* লোক দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উদ্দেশ্য। কারণ, তিনি তাবেঈ ছিলেন। আর তাঁর উস্তাদ ছিলেন স্বয়ং সাহায়েকেরাম।)

চুরি বা বিনষ্ট হতে না পারে। এভাবে তাঁরাও জীবনের প্রতিটি মূহুর্তকে বর্ণনাতীতভাবে হিফাযত করতেন যাতে জীবনের একটি মুহুর্তও কোন অযথা বা অসমীচীন কাজে ব্যয় না হয়। তাঁরা ভাবতেন, সময় আল্লাহর দেয়া একটি বড়ই অমূল্য নেয়ামত। যার নেই কোন নির্দিষ্ট সীমা রেখা। আর কতদিন এ নেয়ামত বিদ্যমান থাকবে তাও জানা নেই। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ব্যয় করতে হবে এই সময়কে’।

দু’রাকাত নফল নামাযের মূল্য

একদা রাসূল (সঃ) একটি করবের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সাথে ছিলেন বহু সাহাবায়ে কেরাম। পথিমধ্যে নবীজী (সঃ) তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, দেখ আজ তোমরা দু’রাকাত নামায খুব স্বল্প সময়েই পড়ে ফেলতে পার এবং এ কে তোমরা হয়ত খুবই নগণ্য মনে কর। কিন্তু আমাদের পাশে এ কবরে যে ব্যক্তি শায়িত তার নিকট দু’রাকাত নামাযের মূল্য পুরো দুনিয়া ও তার মধ্যবর্তী সব কিছু থেকেও বেশী। কারণ, সে এখানে শুয়ে শুয়ে শুধু আফসোস ও অনুতাপ করছে, হায় ! যদি জীবনে আরও দু’মিনিট সময় বেশী পেতাম, আর এর মাঝে আরও দু’রাকাত নামায পড়ে নিতাম, তবে আজ কতইনা লাভবান হতাম।

কবরস্থ ব্যক্তির উপদেশ

হযরত আলীর (রাঃ) অমর বাণী সংগৃহীত মুফ্‌তী শফীর (রাঃ) একটি মূল্যবান বয়ান মনে পড়ে—এক ব্যক্তি একটি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন কবরে শায়িত ব্যক্তি পথচারীকে উদ্দেশ্য করে আবৃত্তি করতে লাগল

مقبرے پرگزرنے والے سن × ٹھہر ہم پرگزرنے والے سن

*অর্থাৎ, ওহে অতিক্রমকারী পাশ দিয়ে মোর গোরখানা * দাঁড়িয়ে শোন মোর বাতখানা*

هم بهی ایک دن زمین پر چلتے تھے × باتوں باتوں پر مچلتے تھے

আমিও একদিন বিচরণ করতাম এ ধরাধামে

ক্ষণে ক্ষণে মেতে উঠতাম আনন্দ উল্লাসে।

উক্ত ছন্দ দ্বয়ের মাধ্যমে কবরস্থ ব্যক্তি তার জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়ে দিল যে, আমিও এ দুনিয়ার অধিবাসী ছিলাম। তোমার মতই খাওয়া-পরা চলা-ফেরা করতাম। কিন্তু মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাটি জীবন আমি যা অর্জন করেছি তার এক বিন্দুও আমার সঙ্গে আসেনি। আল্লাহর ফজলে যেটুকু নেক আমল করতে পেরেছি শুধু তা-ই আমার সাথে এসেছে। ওহে! মনে রেখো, তোমার সাথেও দুনিয়ার কিছুই যাবেনা। যাবে শুধু 'নেক' আর 'বদ'। তাই নেক কাজ কর। আজ আমার অবস্থা হল, আমি সর্বক্ষণ ফাতেহার অপেক্ষায় থাকি। আহ! যদি আল্লাহর কোন বান্দা এসে আমার উপর সূরায়ে ফাতেহা পড়ে ইসালে সাওয়াব করত! হে যাত্রী. তোমার এখনও জীবনের মূল্যবান মুহুর্তগুলো হাতের নাগালে আছে। সুযোগ থাকতে কাজে লাগাও।

আমলই এক মাত্র সঙ্গী

পৃথিবীতে মানুষ গাড়ি-বাড়ি-নারী বহু কিছুই করে। বহু বিলাসী জীবন যাপন করে। কিন্তু কেউ একথা স্বপ্নেও ভাবেনা যে, একদিন এ সবই আমাকে ছেড়ে যেতে হবে। শুধু তিন/পাঁচ টুকরো সাদা কাপড় সাথে নিয়ে পরপারে পাড়ি দিতে হবে। আর যদি কপাল মন্দ হয় তাহলে হয়তো এটাও মিলবেনা। সবশেষে আমার চিরসাথী হবে এ নশ্বর জীবনের ভাল-মন্দ ক্রিয়া-কর্ম। নবী করীম (সঃ) উম্মতকে এ কথা বুঝাতে গিয়ে বলেছেন– মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে যখন কবর অভিমুখে যাত্রা শুরু হয় তখন তিনটি বস্তু তার সঙ্গী হয়, তার সাথে যায়।

এক. তার প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব।

দুই. তার কিছু মাল, যেমনঃ লাইট, খাট, কফিন, খন্তা ইত্যাদি।

তিন. তার জীবনের ভাল-মন্দ আমল।

প্রথম দু'টি বস্তু তাকে কবরস্থ করার পর ফিরে চলে আসে।

আর তৃতীয়টি তার সঙ্গী হয়ে চিরদিন তার সাথে থেকে যায়। (বুখারী)

জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন–

شکریہ اے قبرتک پہنچانے والو شکریہ

اب اکیلے ہی چلے جائی گے اس منزلے ہم –

কবর পর্যন্ত পৌঁছেদাতা গণ, শুক্‌রিয়া তোমাদের

এখান থেকে একাই রওনা হব মোরা মান্‌জিলে মোদের।

মৃত্যুর বাসনা

নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ কখনো মৃত্যুর আকাংখ্যা করোনা। চাই যত দুঃখ-কষ্টেই থাকনা কেন। মসীব্বতে পড়ে এ দোয়া করোনা, হে আল্লাহ আমার মৃত্যু দিয়ে দাও। কারণ যদিও তুমি! দুঃখ-কষ্টের যাতনায় ক্লিষ্ট তবুও জীবনের যে সময়টুকু আজ তোমার হাতে আছে তাতে হয়তো তুমি এমন কোন কাজ করার সুযোগ পেয়ে যাবে, যা আখেরাতের নাজাতের উসিলা হয়ে যাবে। তাই কস্মিন কালেও মৃত্যুর আকাংখা করোনা, বরং আল্লাহ্ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং এ দোয়া কর, হে প্রভু ! আপনি আমাকে যে সময়টুকু দান করেছেন তাতে নেক আমল করার তাওফিক দান করুন।

অতিরিক্ত কথাবার্তা থেকে বাঁচার কৌশল

অধিক কথা বলা সত্যিই অপ্রিয়। তাই তো নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন–

من حسن اسلام المرء ترکه مالا یعنیه

মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অহেতুক কথা-কাজ পরিহার করা। সাহাবায়ে কেরাম অধিক কথা বলা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মুখে আস্ত সুপারি পুরে রাখতেন। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় অধিক কথা বলতে

গেলে কথার বিভিন্ন ফাঁক-ফোঁকরে অনেক মিথ্যা কথা স্থান পেয়ে যায়। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথায় তুলে নিতে হয় গুনার এক বিরাট বোঝা। এছাড়াও দেখা যায় কথার প্যাঁচে হয়ত এমন একটি অযাচিৎ বাক্য বেরিয়ে এল যার কারণে উপস্থিত জনতার সামনে লজ্জাও পেতে হল।

তাই আমাদের পূর্বসূরী দু'বুযুর্গ অধিক বাক্যালাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। আমার পিতা মুফ্তী শফী (রঃ) হযরত মিয়া আসগর হুসাইন সাহেবের একটি চমৎকার ঘটনা শুনিয়েছেন– এক দিন তিনি মিয়া সাহেবের কাছে গেলেন। মিয়া সাহেব (রঃ) তাকে বললেন, শফী সাহেব ! আজ আমরা আরবীতে কথোপকথন করব। আমার পিতা বলেন, তখন আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারণ, অদ্যাবধি কখনও তাঁকে এমনটি বলতে শুনিনি। আজ কেন তিনি হঠাৎ এমনটি বলছেন! আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ প্রস্তাব ? এর রহস্য কি ? উত্তরে তিনি বললেন, দেখুন, আমরা যখন পরস্পরে কথা-বার্তা বলি তখন আমাদের থেকে অনেক অহেতুক কথা প্রকাশ পায়। যবান সংযত থাকে না। আর যেহেতু অনর্গল আরবী বলা আমরা কেউই পারিনা, তাই আরবী বলতে গেলে শুধু প্রয়োজনীয় কথা-বার্তাই হবে, অতিরিক্ত কথা থেকে আমরা বেঁচে যাব।

আমাদের দৃষ্টান্ত

হযরত মিয়া আসগর হুসাইন সাহেব (রঃ) বলেন, আমাদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে অনেক ধন-সম্পদ ও স্বর্ণ-রূপা নিয়ে ভ্রমণে বের হয়েছিল। পথিমধ্যে স্বল্প মাত্রা ছাড়া তার সমস্ত মাল খরচ হয়ে গেছে। অথচ তার সফরের এখনও প্রায় চৌদ্দ আনাই বাকী। এ অবস্থায় সে এই সামান্য মাল খুব দেখে-শুনে সতর্কতার সঙ্গে ব্যয় করবে যাতে সামান্যতম অর্থও অহেতুক ব্যয় না হয়। তিনি বলেন, ঠিক এভাবে আমাদের এ জীবনেও প্রচুর সময় অনর্থক ব্যয় হয়েছে। এখন আর সামান্য বাকী আছে। অথচ পরকালের সম্বল এখনও দু'আনাও জোগাড় হয়নি। তাই কখনও যেন কিঞ্চিৎ পরিমাণ সময়ও কোন অনর্থক কাজে ব্যয় না হয়।

সময়ের সদ্ব্যবহারে হযরত আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ)

শায়েখ ডাঃ আব্দুল হাই (রঃ) বলেন, আমি স্বয়ং হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী (রঃ) কে দেখেছি। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন চিকিৎসকরা তাঁকে কথা-বার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তখনকার কথা—একবার তিনি চক্ষু বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছেন। হঠাৎ চোখ খুলে বললেন, মাওলানা শফী সাহেবকে ডাক। তাকে ডাকা হল। থানভী সাহেব (রঃ) তাকে বললেন, আপনি তো আহ্‌কামুল কোরআন লিখছেন। আমার এক্ষুণি একটি কথা মনে পড়ল। এটি আপনি কিতাবের যথাস্থানে সংযোজন করে দিবেন। এরপর কথাটা বলে তিনি আবার চক্ষু বন্ধ করে ফেললেন। একটু পর আবার চক্ষু খুলে অন্য এক লোককে ডাকতে বললেন, তাকে উপস্থিত করা হল। তিনি তাকেও এভাবে একটি কাজ বুঝিয়ে দিলেন। এরূপ তিনি বার বার করছিলেন। তখন মাওলানা শিব্বীর আলী সাহেব তাঁকে ডাক্তার ও হাকিমগণের 'কথা না বলার' পরামর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রত্যোত্তরে থানবী (রঃ) বললেন, কথা তো তোমরা ঠিকই বলেছ ; কিন্তু আমি তো চিন্তা করি—

وہ لمحات زندگی کس کام کے جوکسی کی خدمت میں خرچ نہ ہو

اگر کسی کی خدمت میں زندگی گزر جائے تویہ اللہ تعالی کی نعمت ہے

জীবনের সে মুহূর্তগুলো কি কাজে আসবে যা কারো খেদমত, এবং কল্যাণে ব্যয় হবে না। যদি কারো খেদমতে জীবন অতিক্রান্ত হয় তবেই আমি ধন্য।

হযরত থানবী (রঃ) চব্বিশটি ঘন্টাকে রুটিন মাফিক ব্যয় করতেন একটি মুহূর্তও তাঁর এদিক সেদিক হতনা। আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁর দু'জন স্ত্রী ছিল। সুন্নাত অনুযায়ী তিনি আসরের নামাযের পর স্ত্রীদের সাক্ষাতে যেতেন। সেখানেও সময় ছিল একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। যেমন ঃ যদি এক স্ত্রীর নিকট পনের মিনিট বসতেন, তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর

নিকটও পনের মিনিটই বসতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল তিনি ঘড়ি দেখেই বের হতেন। এমনটি হতনা যে, পনের মিনিটের স্থানে ষোল বা চৌদ্দ মিনিট অবস্থান করতেন। মেপে মেপে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহন করতেন।

সুধী, সময় নামক আল্লাহর এ নেয়ামতটিকে হেলায়-খেলায় কেটে দিবেন না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ একটি নেয়ামত। এর প্রতিটি মুহূর্ত বড়ই দামী। এটি প্রতিনিয়তই বরফের ন্যায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন–

هورهی هے عمر مثل برف کم × چپکے چپکے رفته رفته دم بدم

জীবনের মুহূর্তগুলো তুষার খন্ডের ন্যায় যাচ্ছে কমে, চুপে চুপে চলছে তা ক্ষণে ক্ষণে।

জন্মোৎসবের প্রকৃত তত্ত্ব

যখন জীবনের একটি বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায় তখন মানুষ জন্ম বার্ষিকী, জন্মদিবস বা বার্থ ডে পালন করে। এতে সীমাহীন আনন্দ-উল্লাস করে। মোম বাতি জ্বালায়। বিশাল আকারের কেক কাটে। আরো কত কি ! তা আল্লাহই ভাল জানেন !

এই জন্মোৎসব সম্পর্কে প্রখ্যাত কবি আকবার ইলাহাবাদীর কবিতার একটি পংক্তি খুবই তত্ত্বমূলক, সেখানে তিনি বলেছেন–

جب سالگره هوئ تو عقیده یه کهلا × یهاں اور گره لے ایك برس جاتا

যার মর্মার্থ হল– আল্লাহ তায়ালা জীবনে যতগুলো বৎসর দান করেছেন তার একটি বৎসর হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই এটা আনন্দের বিষয় না ক্রন্দনের ?

বস্তুত এটা তো ছিল আফসোস ও আক্ষেপের বিষয় যে, জীবনের একটি বৎসর আমার থেকে বিদায় নিয়ে গেল। আমার পিতা হযরত

মুফতী শফী (রঃ) তাঁর তেইশ বৎসর বয়স থেকে নিয়ে বাকী জীবনে জন্ম দিবসকে শোক দিবস হিসেবে কাটিয়েছেন। যখন তাঁর জীবনের একটি বৎসর অতিবাহিত হত তখন তিনি মরসিয়া পাঠ করতেন। (সাধারণতঃ মানুষের মৃত্যুর পর তার উপর মরসিয়া ক্রন্দন করা হয়।) যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করেন তাহলে আমরা নিশ্চয় বুঝতে সক্ষম হব যে, বাস্তবিক পক্ষেই যে সময়টুকু অতিবাহিত হয়ে গেছে তা আর কখানো ফিরে আসার মত নয়। তাই তার উপর আনন্দ-উল্লাস করার কোনই যৌক্তিকতা নেই। বরং আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে, এটি আমাদের আগামী দিনের চিন্তার উৎস এবং অনাগত দিনগুলোকে কাজে লাগানোর মাইলফলক। আল্লাহ আমাদের কে বোধোদয় দান করুন।

কাজ তিন প্রকার

হযরত ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, দুনিয়াতে যত কাজই হচ্ছে বা মানুষ যত কাজই করছে তা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত ঃ কাজটা হবে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। চাই সে কল্যাণ দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী।

দ্বিতীয়ত ঃ কাজটা হবে ক্ষতিকর বা ধ্বংসাত্মক। সে ক্ষতি চাই দ্বীনি হোক আর দুনিয়াবী।

তৃতীয়ত ঃ কাজটা এক দিকে যেমন মঙ্গল ও কল্যাণহীন অন্য দিকে তেমনি তাতে কোন ক্ষতিকর দিকও নেই। না পার্থিব না পারত্রিক।

উক্ত তিন প্রকারের তৃতীয় প্রকার হল অহেতুক কাজ। তাই এটি বর্জনীয়। এছাড়াও দ্বিতীয় প্রকার তো দ্বিধাহীন চিত্তেই ছেড়ে দেয়া অত্যাবশ্যক। কারণ তা ক্ষতিকর। উপরন্তু যদি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে তৃতীয় প্রকারও (যাতে উপকার বা ক্ষতি কোনটিই নেই) ক্ষতিকর হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ, যখন মানুষ এ ধরণের কাজে

লিপ্ত হয়ে নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে শুরু করে তখন 'সময় নষ্ট' হওয়ার বিচারে প্রকারান্তরে এটাও ক্ষতিরই শামিল। সুতরাং তৃতীয় প্রকারের কাজে লিপ্ত হয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা আদৌ সঙ্গত হবেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি একটি দ্বীপে প্রবেশ করল। যেখানে স্বর্ণের একটি স্তুপ রয়েছে। স্তুপের মালিক প্রবেশকারী কে বলল, এখানে তোমার যতক্ষণ থাকার অনুমতি রয়েছে ততক্ষণ তোমার যাচ্ছে স্বর্ণ নিতে পার। কিন্তু জেনে রেখো, আমি হঠাৎ যে কোন মুহূর্তে তোমার এখানকার অবস্থানাধিকার বাতিল করে দেব। আর এ-ও জেনো যে, বাতিলের পর তুমি আর এক বিন্দু স্বর্ণও উঠাতে পারবে না। আর আমি কখন তোমার অধিষ্ঠান বাতিল করব তাও তোমাকে জানাচ্ছিনা, এবং বাতিলের পর তোমাকে দ্বীপ থেকে জোর পূর্বক বের করে দেয়া হবে।

সুধী ! একটু ভেবে দেখুন, উক্ত পরিস্থিতিতে প্রবেশকারী ব্যক্তি কি একটি মুহূর্তও অযথা বিনষ্ট করবে ? সে কি এটা ভাববে যে, এখনও হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে, একটু বিশ্রাম করে নেই, পরে স্বর্ণ সংগ্রহ করবো ? নিশ্চয়ই নয়। বরং সে সর্বক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, কি ভাবে কত বেশী নেয়া যায়। কারণ, সে যা কুড়িয়ে নিবে তাই তার। এখানে অন্য কেউ অংশীদার হবে না। ঠিক এভাবেই আমাদের কেও স্বল্প পরিসরের এ মূল্যবান সময়ে নেকী অর্জনে ব্রতী হতে হবে।

এক ব্যবসায়ীর আজব ক্ষতি

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মুফতী শফী (রঃ)-এর নিকট এক ব্যবসায়ী আসা-যাওয়া করত। সে ছিল বড় মাপের একজন ব্যবসায়ী একদিন সে এসে বলল, হযরত ! আমার জন্য একটু দোয়া করুন। ব্যবসায় আমার বড় ধরণের একটা ক্ষতি হয়ে গেছে ! মুফতি শফী সাহেব বলেন, তার ক্ষতির সংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হলাম। তাকে

জিজ্ঞেস করলাম, ভাই কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ? সে বলল, লাখ খানেক ! এরপর বিশ্লেষণে দেখা গেল, তার নির্দিষ্ট লাভের চেয়ে বাড়তি আরও প্রায় এক লাখ টাকা আসার কথা ছিল, কিন্তু তা আসেনি। এটাকেই সে বড় ধরণের ক্ষতি বলে প্রকাশ করেছে।

মুফতী শফী সাহেব বলেন, আজ মানুষের পার্থিব সম্ভাব্য কিছু মুনাফা না আসায় সে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অথচ দ্বীনি ব্যাপারে যে সত্যিই কত মারাত্মক ধরণের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সেদিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই।

এক বণিকের ঘটনা

ঘটনাটি কিছুটা হাস্যকর। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি অনুধাবন করার মন ও ক্ষমতা দেন তবে এটি উপদেশ মূলকও। আমাদের এক বুযুর্গ ঘটনাটি শুনিয়েছেন– এক আঁতর ব্যবসায়ী। সে ঔষধও বিক্রি করত। তার এক ছেলে তাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করত। প্রয়োজনে দোকানেও বসত। একবার সে বাহিরে কোথাও যাওয়ার সময় ছেলেকে সব জিনিষের দাম বুঝিয়ে দিল। ছেলে দোকানে বসল। এদিকে একজন গ্রাহক এসে দু'বোতল শরবত ক্রয় করতে চাইল। ছেলেটি একশ' করে দু'বোতল শরবত বিক্রি করল? ইতোমধ্যে তার পিতা ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল– কি কি বিক্রি করেছ। ছেলে বলল, অমুক জিনিষ দু'বোতল দু'শ' টাকায় বিক্রি করেছি। একথা শুনে পিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ছেলেকে বলল, তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ। এর প্রতিটি বোতল এক হাজার টাকা করে। আর তুমি মাত্র একশ' টাকায় বিক্রি করেছ। পিতার এ ধরণের অনুতাপ ও আফসোস ছেলেকে দারুন ভাবিয়ে তুলল। ছেলে পেরেশান হয়ে পড়ল। ছেলের এই পেরেশানী দেখে পিতা সান্ত্বনার স্বরে বলল, আরে ! পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। তুমি যে বোতল একশ' টাকায় বিক্রি করেছ তাতে আটানব্বই টাকাই লাভ হয়েছে। বাকী ,একটু সতর্ক হলে দু'হাজার টাকা হত। ক্ষতি হলে এটাই হয়েছে।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, দুনিয়ার কাজে যে ভাবে মানুষ সম্ভাব্য লাভ না হওয়াকে ক্ষতি বলে মনে করে দ্বীনের ব্যাপারেও এ ধরণের চিন্তা করা উচিৎ। যদি জীবনের কোন মুহূর্ত এমন কাজে ব্যয়িত হয় যাতে কোন উপকারীতা নেই, তাহলে নিশ্চয় তা ক্ষতিরই শামিল। কারণ যদি তুমি সচেষ্ট হতে তাহলে এ সময়ে আখেরাতের অনেক বড় উপকার করে নিতে পারতে তাই খুব চিন্তা ভাবনা করে জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সঠিক কাজে ব্যয় কর।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় সময়ের সাশ্রয়

বিষয়টি সত্যিই বিবেচ্য যে, বর্তমান যুগে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কত অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন এবং এমন এমন নেয়ামত দান করেছেন যা আমাদের পূর্বপুরুষগণ কোন দিন কল্পনাও করেনি। যেমন ঃ আগেকার দিনে (বর্তমানেও গ্রামে গঞ্জে) রান্না-বান্নার জন্য কাঠ, খড়ি, লতা-পাতা ও ডাল-পালা সংগ্রহ করতে হত। আবার এগুলো শুকোতে হত। আরও কতকি ? কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌ বর্তমানে গ্যাসের চুলা সে পূর্বেকার সব ঝক্কে-ঝামেলা দলিত করে এনে দিয়েছে শারীরিক শান্তি ও মানসিক স্বস্তি। দিয়েছে সময়ের বিরাট সাশ্রয়। আগের দিনে রুটি বানাতে হলে গম এনে চাক্কিতে পিষতে হত। খামীর করতে হত। তারপর রুটি। কিন্তু আজকাল মেশিনের সুইচ অন করলেই রুটি হাজির। আগে হজ্জ করতে হলে মাস কে মাস পথে পড়ে থাকতে হত। আর আজকাল মাত্র কয়েক ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায়। এ ছাড়াও কম্পিউটার, ইন্টার নেট, টেলেক্স, ই-মেইল এক কথায় আধুনিকতার সবগুলো উপহারই আমাদের জীবন প্রবাহে এনে দিয়েছে সময়ের এক বিরাট সাশ্রয়।

আল্লাহ পাক আমাদের এত প্রচুর সময় বাঁচিয়ে দিলেন। কিন্তু এ সময়গুলো গেল কোথায় ? কি কাজে এসেছে আমাদের ? কোথায় ব্যয় হচ্ছে এ সময়গুলো ? যদি কাউকে বলা হয় অমুক আমলটি কর। উত্তরে

সে বলবে সুযোগ নেই। অথচ আগের কালের লোকেরা সব কাজ আঞ্জাম দেয়া সত্ত্বেও নফল ইবাদত, জিকির, তেলাওয়াত সবই করার ফুরসত পেত। কিন্তু এখনকার লোকদের কিছুই করার সুযোগ মিলেনা। এখন মানুষ শুধু অস্থির! সময় নেই! অবসর নেই! সময় কেন নেই ? আল্লাহ্ তায়ালা তো সময় এ জন্যই দান করেছেন যে, তাতে মানুষ তাঁকে স্মরণ করবে। তাঁর দিকে মনোনিবেশ করবে। তাই আমাদের উচিৎ , আখেরাতের পাথেয় জোগাড় করা। সময়ের এ বিরাট সাশ্রয় হাতের মুঠোয় পেয়ে খেলা-ধূলা, টিভি, সিনেমা, ভি. সি. আর, গল্প-গুজব ইত্যাদিতে না কাটিয়ে আল্লাহর পথে ব্যয় করা।

মহিলাদের মধ্যে সময়ের বেশী অবমূল্যায়ন

সময় নষ্ট করার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত মহিলাদের মাঝেই বেশী লক্ষ্য করা যায়। যে কাজ এক মিনিটে সম্পন্ন করতে পারবে তাতে এক ঘণ্টা ব্যয় করে ফেলে। আর যখন পরস্পরে আলাপ-আলোচনা শুরু করে তখন তো আর কথাই থাকে না। আর এতে যে কত গীবত, মিথ্যা ও উপহাস মূলক কথা সংগঠিত হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই তাদেরকে এ ব্যাপারে অধিক সতর্ক হওয়া উচিৎ। কারণ, এভাবে চলতে থাকলে একদিন দেখা যাবে খালি হাতেই তাদেরকে পরপারে যাত্রা করতে হবে। আর পাথেয়হীন সফর যে কত দুঃসহ তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউই উপলব্ধি করতে পারে না।

নবী পত্নী ও তাঁদের কন্যাগণও তো মহিলা ছিলেন। কিন্তু তাঁরা তো বর্তমান যুগের নারীদের মত গল্প-গুজবে সময় কাটিয়ে রিক্ত হস্তে গোর যাত্রার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই তারা দুনিয়ায় থেকেও জান্নাতের সার্টিফিকেটে ধন্য। আজকের মহিলা সমাজকেও সে পথ অনুসরণ করতে হবে। তবেই তারা হবেন সফল কাম।

প্রতিশোধ নিতে গিয়ে কেন সময় নষ্ট করবো ?

আল্লাহর ওলিদের সম্পর্কে জানতে এক ব্যক্তির কৌতূহল সৃষ্টি হল। এই অদম্য কৌতূহল নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথিমধ্যে এক বুযুর্গের সাথে তার সাক্ষাৎ হল। তার নিকট সে নিজের উদ্দেশ্য খুলে বলল। সে বুযুর্গ তাকে বলল, তুমি অমুক মস্‌জিদে যাও সেখানে দেখবে তিনজন বুযুর্গ জিকিরে লিপ্ত আছেন। তুমি পেছন দিক থেকে গিয়ে প্রত্যেককে এক একটি করে আঘাত করবে। সে ব্যক্তি এ বুযুর্গের পরামর্শানুযায়ী মস্‌জিদে গেল। সেখানে সত্যিই তিন জনকে যিকিররত পেল। সে পেছন দিক দিয়ে গিয়ে এক জনকে (হাল্কা) একটা আঘাত করল। কিন্তু আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি একটু পেছনে ফিরেও তাকালেন না। যিকিরই করে যাচ্ছে। এই লোকটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল যে, কোন প্রতিবাদ আসে কি না। কিন্তু না, তিনি আপন মনে যিকির করেই যাচ্ছেন। তখন লোকটির ভাবান্তর হল এবং কৌতূহল আরও বেড়ে গেল যে, এ কেমন কথা যে, একটু তাকালও না ! পরে তার ভাবনার অন্ধকার কেটে গেল যে, হ্যাঁ, হয়ত এই বুযুর্গ ভাবছেন যে, যে সময়ে আমি পেছনে তাকিয়ে আঘাতকারীকে দেখব এবং প্রতিশোধ নেব, সে সময়ে আমি বহু বার আল্লাহকে স্মরণ করতে পারবো। আর এতে আমার যে উপকার হবে, বদলা নিলে তা কখনও হবেনা।

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ সাহেবের সময়ের মূল্যায়ন

হযরত মিয়াজী নূর মুহাম্মদ (রঃ) -এর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি কোন কিছু ক্রয় করার জন্য বাজারে যাওয়ার সময় টাকার ব্যাগ হাতেই রাখতেন। আর ক্রয় করার পর টাকা-পয়সা নিজ হাতে গণনা করে দোকানদারকে দিতেন না বরং টাকার ব্যাগ দোকানদারের হাতে দিয়ে বলতেন, তুমি নিজ হাতে টাকা গণে নাও। দোকানদাররা তাই করত। তিনি ভাবতেন, আমি যদি গণতে যাই তাহলে এতে যে সময়টুকু ব্যয় হবে তাতে আমি কয়েক বার 'সুবহানাল্লাহ' পড়তে পারবো।

একবার তিনি টাকার ব্যাগ হাতে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পেছন থেকে এক ছিনতাইকারী এসে তাঁর মানি ব্যাগটি টেনে নিয়ে গেল। হযরত মিয়াজী সাহেব একটু মুখ ফিরিয়েও পেছনের দিকে তাকালেন না। কে ছিন্‌তাই করল, কোন দিকে গেল কিছুই দেখলেন না। ফিরে বাড়ী চলে এলেন।

তাঁরাই ছিলেন সময়ের প্রকৃত মূল্যদাতা। তাঁদের ধ্যান-ধারণাই ছিল ব্যতিক্রম। তাঁদের প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসই আল্লাহর যিকিরে ব্যয় হত। তাঁদের পদাংঙ্ক অনুসরণ আমাদের একান্ত কর্তব্য। তবেই আমাদের জীবন হবে সার্থক।

কাজ দ্রুত সেরে নাও

এটি মূলতঃ একটি হাদীসের অংশ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) ইরশাদ করেন, আমি একটি কুঁড়ে ঘরে বসবাস করতাম। একবার ঘরটি ভেঙ্গে গেল। তখন আমি সেটি মেরামত করছিলাম, এমন সময় রাসূল (সঃ) আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, ওহে ! কি করছ ? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমার এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরটি মেরামত করছি। তখন রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করলেন, 'কাজ তো আরও দ্রুত সম্পাদন করে নেয়ার মত।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা জীবনের যে সময় টুকু দান করেছেন তার সম্পর্কে কারও জানা নেই যে কবে তার সমাপ্তি ঘটবে। কখন মৃত্যু ঘন্টা বেজে ওঠবে। আখেরাতের জীবন আরম্ভ হয়ে যাবে। তাই খুব দ্রুত কাজ সেরে নেয়া উচিৎ। অথচ তুমি এ ধরণের মূল্যবান সময়ে ঘর মেরামতের অযথা কাজে লিপ্ত রয়েছ– (আবু দাউদ)।

উক্ত ঘটনা এ কথা বুঝায় না যে, রাসূল (সঃ) সাহাবায়ে কেরামগণকে দুনিয়াতে ঘর-বাড়ী নির্মান করতে নিষেধ করেছেন, বরং তিনি এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, দুনিয়াবী কাজ-কর্ম যেন পার্থিব ধ্যান ধারণায় না হয়, তা যেন আখেরাতের প্রস্তুতির মাধ্যম হয়।

দুনিয়ার সাথে নবীজীর (সঃ) সম্পর্ক

হযরত আয়শা (রাঃ) ইরশাদ করেন– রাসূল (সঃ) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন তখন তাঁর পবিত্র দেহ মুবারকে চাটাই'র দাগ বসে যেত। তাই একদিন আমি বিছানা চাদরটি ডাবল করে বিছালাম যেন নবীজীর (সঃ) গায়ে দাগ না পড়ে এবং তিনি যেন আরাম পান। শোয়ার সময় রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন, হে আয়শা ! চাদর ডাবল করোনা। পূর্বের ন্যায় থাকতে দাও।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে– একদা হযরত আয়শা (রাঃ) শখ করে ঘরের দেয়ালে ছবি অংকিত একটি চাদর টানালেন। এতে রাসূল (সঃ) 'যার পর নাই' অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, তুমি যতক্ষণ এ পর্দা না সরাবে ততক্ষণ আমি গৃহে প্রবেশ করব না। এরপর আরেক দিন তিনি আরেকটি চাদর টানালেন (তাতে ছবি ছিল না)। তবুও রাসূল (সঃ) বললেন, হে আয়শা !

مالی وللدنیا ما انا ولدنیا الا کراکب

استظل تحت شجرة ثم راح وترك

অর্থ, আমি দুনিয়া দিয়ে কি করব ? আমার দৃষ্টান্ত তো সে যাত্রীর ন্যায় যে, স্বল্প সময়ের জন্য কোন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। এরপর আবার স্বীয় গন্তব্যের দিকে ছুটে চলে।

বস্তুত ঃ প্রিয়নবী (সঃ) উম্মতকে দুনিয়াবী কাজ কর্ম হতে নিষেধ করেন নি, বরং এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, এই নশ্বর পৃথিবীর পেছনে বেশী সময় ব্যয় করো না। আখেরাতের প্রস্তুতিকেই প্রাধান্য দাও।

দুনিয়ার কাজে সময় ব্যয়

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন–

اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للاخرة بقدر بقائك فيها

অর্থ, দুনিয়ার জন্য সে পরিমাণ মেহনত কর যে পরিমাণ সময় তোমাকে এখানে থাকতে হবে। আর আখেরাতের জন্য সে পরিমাণ চেষ্টা এবং সময় ব্যয় কর যে পরিমাণ সময় তোমাকে সেখানে থাকতে হবে।

আখেরাতে আমাদেরকে থাকতে হবে সদাসর্বদা এবং অনাদি-অনন্ত কাল। তাই তার জন্য মেহনতও করতে হবে সীমাহীন। আর দুনিয়াতে আমরা থাকবো অনুর্ধ্ব ৬০-৭০ বছর। আর এরও কোন গ্যারান্টি নেই। তাই এর জন্য সামান্যতম মেহনতই যথেষ্ট। এটাই প্রিয় নবীর (সঃ) শিক্ষা। অথচ আজ আমরা চব্বিশটি ঘন্টাই শুধু দুনিয়া-দুনিয়া করে মরছি। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করতেও আমাদের শত আপত্তি, বাধা, দ্বিধা ও নানা বাহানা।

সারা দিন শুধু মসজিদে বা খানকায় বসে থাকার নাম আখেরাতের কাজ করা নয়। দুনিয়াতে মানুষের শত জরুরত আছে। যদি এ জরুরতগুলোকে সাওয়াবের নিয়তে আদায় করা হয় তাহলে এক দিকে যেমন পার্থিব চাহিদা পূরণ হবে তেমনি অপর দিকে পরকালের সঞ্চয়ও হয়ে যাবে। যেমন ঃ পানাহারের সময় যদি সত্যিকারের নিয়ত করা হয় যে, এই পানাহার দ্বারা অর্জিত শক্তি দিয়ে আমি আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবো। ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় যদি নিয়ত করে যে, আল্লাহর রাসূল ও জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাই আমিও করছি। এভাবে প্রতিটি কাজই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে রাসূলের সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী হয় তাহলে সবই ইবাদতে পরিণত হবে এবং এর জন্য সাওয়াবও পাওয়া যাবে।

এ ছাড়াও মানুষের সাধারণতঃ হাতে বা পায়ে কাজ থাকে। মুখ প্রায় সকলেরই অবসর থাকে। বস, কাজ করার ফাঁকে মুখে বেশ আল্লাহর যিকির করা যায়। ফলে বিশুদ্ধ নিয়তের সাওয়াব, সুন্নাত তরিকায় কাজ করার সাওয়াব এবং মুখে যিকির করার সাওয়াব সব মিলিয়ে দেখা যাবে আখেরাতের বিরাট পুঁজি হয়ে গেছে। আর এ ভাবেই আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে জান্নাত দান করবেন। নতুবা মাত্র ৬০-৭০ বৎসরের হায়াতে এত বিরাট গাঁঠুরি বোঝাই করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।

নেক আমলে টালবাহানা

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, হে মানুষ সকল ! তোমরা টাল বাহানা থেকে বেঁচে থাক। মানুষের মন সর্বদা সৎকাজে টাল বাহানা করে। নেক আমল করার সময়-সুযোগ এলে মন বলে আজ থাক। আগামী কাল করবো, পরশু করবো, পরে অবসর পেলে করবো, অমুক কাজ থেকে অব্যাহতি পেলে তারপর করবো। এ রকম আরও হাজারও টাল বাহানা। কিন্তু এটি কস্মিন কালেও ঠিক না। রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, 'কোন নেক কাজে টালবাহানা করো না'। কারণ, যে কাজে টালবাহানা করা হয় তা সাধারণতঃ পরে আর করা হয় না। সেটা পড়েই থাকে। তাই সচেতনতার দাবী এটাই যে, নেক আমল বা অন্য যে কোন ভাল কাজই করার সুযোগ পেলেই করে ফেলা। টালবাহানা করা কোন সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় নয়।

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়

আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ নিজের একটি ঘটনা শুনিয়েছেন যে, হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ সাহেব (রঃ) যিনি হযরত থানভী (রঃ) এর বিশিষ্ট খলীফা ছিলেন।

তিনি একবার আমাকে অভিযুক্ত করে বললেন, আপনি আমার নিকট একেবারেই আসেন না এবং পত্রও লিখেন না। আমি উত্তরে বললাম, হযরত! অবসর পাইনা বিধায় এমনটি হচ্ছে। তিনি বলেন, দেখ, যে কাজ সম্পর্কে বলা হয় অবসর নেই তার অর্থ এই যে, ঐ কাজের গুরুত্ব অন্তরে নেই। কারণ, যে কাজের গুরুত্ব অন্তরে থাকে তার জন্য মানুষ জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে সময় বের করে নেয়। 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'। দেখা যায় যে কাজ করার প্রবল ইচ্ছা থাকেনা সে কাজে সময়ও পাওয়া যায় না।

গুরুত্বপূর্ণ কাজ অগ্রগণ্য

মানুষের হাতে যখন এক সাথে অনেকগুলো কাজ জড়ো হয়ে যায় তখন সে নির্বাচন করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই প্রথমে সম্পাদন করে। দুনিয়াবী কাজে এটাই সচরাচর দৃষ্টি গোচর হয়। ব্যতিক্রম শুধু আখরাতের কাজে। যদি কখনও দুনিয়া এবং আখেরাতের দু'টি কাজ একত্রি হয় তখন আমরা অনেকেই দুনিয়াবী কাজকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি (যদি সেটি একেবারেই তুচ্ছও হয়।) যেমনঃ আসরের জামাতের সময় হয়ে গেছে এমন সময় এক বন্ধু এল। বন্ধুর সাথে নাস্তা করতে হবে এখন দেখা যাবে অনেকেই জামাত তরক করে আগে বন্ধুকে নিয়ে চা-নাস্তা করে। তারপর একা একা নামায পড়ে। এই হল আমাদের অবস্থা। অথচ জামাতে নামায পড়া যে, সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ এটা সবারই জানা । কিন্তু গুরুত্ব নেই বিধায় তাকে স্থান দেয়া হয় সবার শেষে। আবার প্রায়ই পরে করতে করতে কাযাও হয়ে যায়। আল্লাহ্ আমাদেরকে আখেরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করার তাওফিক দিন।

আজই শেষ দিন।

فانك بيومك ولست بغدٍ

فان يكن غد لك فكس فى غد كما كست

অর্থঃ আজকের দিনই শুধু তোমার জন্য নিশ্চিত। আগামী দিন তোমার জন্য নিশ্চিত নয়।

কারো কি এ বিশ্বাস আছে যে, তার জন্য আগামী কাল আসবেই। যেহেতু আগামী দিন আঁসাটা নিশ্চিত নয়, তাই যা কিছু করার আজই করে নাও। আর এ বিশ্বাস ছেড়ে দাও যে, আমি আগামী কালও বেঁচে থাকবো। বরং এভাবে কাজ কর যে, আজকের দিনই আমার শেষ দিন। আজকের ভিতরেই আমাকে সব কিছু সেরে নিতে হবে। তাহলে তোমাকে কমপক্ষে এ লজ্জা পেতে হবে না যে, তুমি গত কালকে বিনষ্ট করছ। এ ভাবে প্রত্যেক দিনকে যদি জীবনের আখেরী দিন মনে করে কাজ করা যায় তাহলে ইন্‌শআল্লাহ্ সাফল্য নিশ্চিত।

আজকের নামাযই শেষ নামায

নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেন, যখন তোমরা নামাযে দাঁড়াবে তখন এই ধ্যান কর যে, এটাই আমার জীবনের শেষ নামায। হয়তো আর কোন নামায পড়ার সুযোগ আমি পাবনা। তাই যত টুকু খোদাভীতি ও ইখ্‌লাসের প্রয়োজন তা এ নামাযেই করে নাও। (ইবনে মাজা)

আজ তো আমরা নামাযে দাঁড়াই দুনিয়ার সব ব্যস্ততা মাথায় নিয়ে। নামাযে দাঁড়ালে আমাদের শুরু হয় নানা হিসাব নিকাশ। ফলে নামাযও প্রকারান্তরে ব্যবসা, চাকরী বা অন্যান্য কর্ম ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। যদি আমরা প্রতিটি নামাযকে জীবনের শেষ নামায মনে করে আদায় করি তাহলে প্রতিটি নামাযই হবে যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ। যা ইহ ও পরকালে আমাদের কাজে আসবে। অন্যথায় আমাদের এই গতানুগতিক ও দায় সারা নামায হাশরের মহা মসিবতের সময় 'প্রজ্জলিত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি' হয়ে দাঁড়াবে। তাই সময় থাকতেই আমাদের সতর্ক হওয়া উচিৎ।

আখেরী কালাম

পরিশেষে আমি বলব, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে গনীমত মনে কর। সে গুলোকে আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর ইবাদতে ব্যয় করার প্রয়াস চালিয়ে যাও। উদাসীনতা, গাফলতী ও অযথা সময় ব্যয় করা থেকে বেঁচে থাক। আল্লাহ তায়ালা মেহেরবানি করে আমাদের মাঝে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন ; যেন আমরা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগিয়ে আল্লাহর যিকির ও আখেরাতের কাজে ব্যয় করতে পারি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দান করুন– আমীন।

পরিশিষ্ট

সময় সম্পর্কে মহা মনীষীগণের উক্তি

* প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'আমি কোন বস্তুর উপর সে পরিমাণ অনুতপ্ত হইনা, যা হই ঐ দিনের উপর যার সূর্য অস্ত যাচ্ছে অথচ আমি তাতে নতুন কোন আমল সংযোগ করতে পারিনি'।

* হযরত উমর (রাঃ) কর্মহীন ও অনর্থক সময় ব্যয় সম্পর্কে ঘৃণা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন, আমার খুবই অস্বস্তি বোধ হয় যখন আমি কাউকে কর্মহীন (চাই দুনিয়াবী কাজ হোক বা আখেরাতের) ভাবে সময় কাটাতে দেখি।

* হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রঃ) বলেন, 'রাত দিন তোমার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সুতরাং দু'য়ের ভিতরেই তুমি আমল করে নাও'।

* হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, 'হে আদম সন্তান ! তুমি তো দিন সমূহের সমষ্টি। যখন একটি দিন চলে গেল তখন মনে রেখো তোমার একটি অংশ চলে গেল।' আমি এমন লোকদের* পেয়েছি যাঁরা নিজ সময়ের প্রতি এমন সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যেমন সতর্ক দৃষ্টি মানুষ স্বর্ণ-রূপার প্রতি রাখে।

* ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, 'আমি দীর্ঘকাল সূফীগণের সংশ্রবে থেকে দু'টি কথা শিখেছি।

এক. সময় হল তলোয়ারের ন্যায়। তুমি তাকে (কোন আমালের মাধ্যমে) কাটবে। অন্যথায় সে তোমাকে (দুশ্চিন্তায় লিপ্ত করে) কাটবে।

দুই. তোমার নফ্সের হিফাযত করবে। কারণ, যদি তুমি তাকে সৎকাজে লিপ্ত না রাখ তাহলে সে তোমাকে কোন মন্দ কাজে জড়িয়ে দিবে।

টীকা

*লোক দ্বারা উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরামগণ

মুমূর্ষ অবস্থায়ও দ্বীনি মাসয়ালা আলোচনা।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর সুযোগ্য ছাত্র ইব্রাহীম ইবনুল জার্‌রাহ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখন আমি খেদমত করার জন্য তাঁর নিকট গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিনি অজ্ঞান হয়ে আছেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর আমাকে দেখে তিনি একটি মাসআলা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চাইলেন, তখন আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, এ মুহূর্তেও মাসআলার আলোচনা! তিনি বললেন, হ্যাঁ, হয়তো বা এ উসিলায় আল্লাহ আমাকে নাজাত দিয়ে দিবেন। এরপর বললেন,

আচ্ছা বলতো, হজ্ব পালনের সময় কোন অবস্থায় শয়তানের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করা উত্তম ? আমি বললাম, আরোহী অবস্থায়। তিনি বললেন, উত্তর সঠিক হয়নি। তখন আমি পাল্টিয়ে বললাম– পায়ে হাঁটা অবস্থায়, এবারও তিনি একই কথাই বললেন। তখন আমি তার নিকট সঠিক উত্তর জানতে চাইলে তিনি বলেন, যখন সে স্থানে দোয়ার জন্য অপেক্ষা করা হয় তখন পায়ে হাঁটা অবস্থায়, আর যখন অপেক্ষা করা হয় না তখন আরোহী অবস্থায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা উত্তম। প্রশ্ন-উত্তর শেষ হওয়ার পর আমি তার থেকে বিদায় নিলাম। গেইটে পৌঁছতেই ভেতর থেকে ক্রন্দন ধ্বনি ভেসে এল। গিয়ে দেখলাম, তিনি আর পৃথিবীতে নেই। মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

এমনই ছিল তাঁদের ইল্‌ম চর্চা এবং সময়ের মূল্যায়ন। তাঁরা সর্বদা মাসআলা মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করতেন। এমন কি জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও। আমারা তো তাঁদের উত্তরসূরী। তাহলে তাঁদের সাধনা ও সময় নিষ্ঠা কি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় নয় ?

খতীবে বাগদাদীর নিকট সময়ের মূল্য

বাগদাদের বিশিষ্ট, মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক খতীবে বাগদাদী (রঃ) একটি মুহূর্তও অযথা ব্যয় করতেন না। এমন কি পথ চলার সময়ও তিনি অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন। সময়কে এভাবে কাজে লাগিয়েই তারা ইতিহাসের সোনালী অধ্যায়ে স্থান নিয়েছেন।

ইমামুল হারামাইন (রঃ)-এর নিকট সময়ের মূল্য

ইমাম গাজালী (রঃ)-এর শায়েখ, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী ইবনে আব্দুল্লাহ আল্ জোয়ানী নিশাপুরী (রঃ)-এর সম্পর্কে আল্লামা আব্দুল গাফের ফারসী (রঃ) তার 'সিয়াকে নিশাপুর' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, আমি এক দিন ইমামুল হারামাইন (যিনি সমস্ত ইমামের ইমাম, ইলেমের প্রদীপ, শরীয়তের পন্ডিত) এর বক্তব্যে শুনছিলাম। তিনি বলছেন, 'আমি স্বভাবগত ভাবে আহার-নিদ্রা এড়িয়ে চলি। তবে হ্যাঁ, তখনি আহার করি যখন তার প্রতি অত্যন্ত অপারগ হয়ে পড়ি এবং তখনি নিদ্রা যাই যখন তা আমার উপর চড়াও হয়ে যায়। চাই দিনে হউক বা রাত্রে। আমার আনন্দ-বিনোদন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সবই ইল্মের আলোচনার ভেতরে।'

সময়ের মূল্যদানে হাফেজ মুনযিরী (রঃ)

হাফেজ মুনযিরী[১] (রঃ) সারাটি জীবন কাটিয়েছেন জ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে। 'না হলে নয়' এমন প্রয়োজনগুলো ব্যতীত তিনি কখনও তাঁর পাঠাগার থেকে বের হতেন না। এমন কি তাঁর পুত্র মাওলানা রশীদুদ্দীনের ইন্তেকালের পরও বাহিরে যাওয়া এড়াতে মাদ্রাসাতেই তার জানাযা সম্পন্ন করা হয়। এরপর লাশ নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মাদ্রাসার

টীকা

১ তাঁর আসল নাম আবদুল আজীম। কিন্তু তিনি হাফেজ মুনযিরী নামে খ্যাত ছিলেন। তিনি মি রের কায়রোতে ৫৮১ হিঃ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৬৫৬ হিঃ ইন্তেকাল করেন।

গেইট পর্যন্ত এসে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, 'এখন তোমাকে আল্লাহর হাতে ন্যস্ত করলাম।' এই বলে তিনি নিজ কক্ষে ফিরে গেলেন।

ইব্রাহীম ইবনে ঈসা নামে তাঁর এক ছাত্র বলেন, আমি কায়রোতে শায়েখের পাশের ঘরে বারো বছর কাটিয়েছি। কিন্তু এক রাতের জন্যও আমি তাঁর গৃহে অন্ধকার দেখিনি। আমি রাত্রে যখনি উঠেছি, দেখেছি বাতি জ্বলছে। তিনি অধ্যয়ন করছেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো আমি তাঁকে খাওয়া-দাওয়া অবস্থায়ও অধ্যয়ন করতে দেখেছি। তাঁর পুরো জীবনটাই ছিল ইল্‌ম চর্চার জন্য উৎসর্গিত।

ইমাম নববী (রঃ)-এর নিকট সময়ের মূল্য

সহীহ মুসলিম শরীফের মহান ভাষ্যকার ইমাম নববী[২] (রঃ) শিক্ষা জীবনে এত শ্রম ও সাধনা করেছেন যে, দু' বছর যাবত তিনি বিছানায় পিঠ লাগাননি। বসে বসে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে আবার লেখা-পড়ায় নিমগ্ন হয়ে যেতেন। সময় নষ্ট হওয়ার ভয়ে তিনি দিন-রাতে মাত্র একবার আহার করতেন। তাও কেবল রুটি! তিনি ফল-মূল খেতেন না এ ভয়ে যে, এতে শরীরে জলীয় অংশ বৃদ্ধি পেয়ে নিদ্রার উদ্ভব ঘটবে। ফলে পড়া শোনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে। তিনি প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের উপর বারোটি পাঠ শুধু পড়তেনই না বরং ব্যাখ্যা সহ মুখস্থও করতেন। পথ চলার সময়ও তিনি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন। এ ভাবেই এ মহা মনীষী সময়ের মূল্য দিয়েছেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার (রঃ) নিকট সময়ের মূল্য

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া *(রঃ) জীবনের একটি মুহূর্তও অহেতুক ব্যয় করতেন না। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা গ্রন্থ রচনা কোন না কোন কাজ তিনি করতেনই। ইতিহাস প্রমাণ করে-তিনি অসুস্থ

টীকা ঃ-২ তাঁর জন্ম ৬৩১ হিঃ তে তার মৃত্যু ৬৭২ হিঃ তে।

টীকাঃ *৬৬১ হিঃ ১০ই রবিউল আউয়াল তাঁর জন্ম এবং ৭২৫ হিজরীতে মৃত্যু।

ও সফররত অবস্থায়ও জ্ঞান চর্চা ও অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন। একবার তিনি অসুস্থ হলে চিকিৎসক তাঁকে পড়া-শোনা না করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, পড়া-শোনা করলে শরীরের উপর প্রভাব পড়বে। ফলে রোগ বেড়ে যেতে পারে। তিনি বললেন, অবশ্যই। তবে বলুন দেখি, হৃদয়-মন প্রফুল্ল হয়, এমন কোন কাজে লিপ্ত থাকলে কি রোগ উপশম হয় না ? ডাক্তার বলল, অবশ্যই হয়। তখন তিনি বললেন, অধ্যয়নে আমার মনে প্রশান্তি অনুভব হয়। তখন ডাক্তার বলল, আপনার এ রোগের চিকিৎসা আমাদের আওতার বাইরে। এ ছিল তাঁদের সময়ের মূল্যায়ন।

ইমাম ইবনে জাওযীর (রঃ) নিকট সময়ের মূল্য

আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ) তাঁর 'সয়দুল খাতের' গ্রন্থে লেখেন মানুষের জন্য নিজের সময়ের গুরুত্ব দেয়া উচিৎ। যাতে একটি মুহূর্তও সৎকর্ম ব্যতিরেকে ব্যয়িত না হয়। সে দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। উত্তম ও গুরুত্ববহ কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া বাঞ্চনীয়, আর অন্তরে সব সময় সৎ কাজের নিয়ত রাখা উচিৎ ,কারণ হাদীস শরীফে এসেছে –

نية المومن خير من عمله

অর্থাৎ ,মোমেনের সৎকাজের নিয়ত তা বাস্তবে পরিণত করা থেকে উত্তম।

অশিক্ষিতদের সময়ের অপব্যয়

ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন, আমি সাধারণ জনগনকে দেখতে পাই যে, তারা নিজেদের মূল্যবান সময়কে শুধুই অহেতুক কাটিয়ে দেয়। যখন রাত গভীর হতে শুরু করে তখন তারা অনর্থক গল্প-গুজবে লিপ্ত হয়ে যায় অথবা এমন ধরণের বই-পত্র পাঠ করতে শুরু করে যা

প্রেম-প্রীতি ও কাল্পনিক কথা-বার্তা দ্বারা সাজানো। যাতে না আছে দুনিয়ার কোন ফায়দা, আর না আখেরাতের। আর যখন প্রভাতের সূর্য উঁকি দেয়ার সময় হয় তখন তারা শোয়। (আধুনিক কালের তাস, জুয়া খেলোয়ার এবং ভি,সি, আর, বা চ্যানেল দর্শকরা যেমনটি করে।)

আর যখন সকাল গড়িয়ে বিকাল আসে তখন তারা কোন বাজার বা নদীর তীরে গিয়ে আড্ডা জমিয়ে সময় অতিবাহিত করে। আমি মনে করি, এরা তাদের ন্যায় যারা নদীতে মাঝি বিহীন ভাসমান নৌকায় বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত, দ্বীন-দুনিয়ার প্রতি যাদের কোন খবর নেই। এ নৌকা তাদেরকে কোত্থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে দিকেও ভ্রূক্ষেপ নেই বিন্দু মাত্রও।

আমি এমন লোক খুবই কম পেয়েছি যারা আখেরাতের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। আর এরাই সর্বদা পুঁজি সঞ্চয় ও সফরের পাথেয় জোগাড়ে এক পায়ে দাঁড়ানো। এদের দুনিয়া-আখেরাত উভই সার্থক।

পারস্পারিক সাক্ষাতে সময়ের হিফাযত

ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন, আমি যখন দেখলাম যে, সময় সব চেয়ে বেশী মূল্যবান সম্পদ। যার নজীর দুনিয়াতে আরেকটি নেই। আর সময়ের বাগানকে আমলের ফুল দ্বারা সুসজ্জিত করা প্রয়োজন। তখন অহেতুক মেলামিশা এবং জনগণের সাক্ষাৎ আমার নিকট অপ্রিয় হতে লাগল। তাই যারা আমার সাক্ষাতে আসে তাদের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করলাম যে, যদি তাদেরকে আমার কাছে আসতে বারণ করি, তাহলে আমার এবং তাদের মাঝে স্থাপিত সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হবে। আর যদি সুযোগ দেই, তাহলে আমার সময় নষ্ট হবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, যতটা সম্ভব সাক্ষাৎ থেকে বেঁচে থাকবো। আর নিরুপায় হয়ে

পড়লে সাক্ষাৎ করবো কিন্তু সংলাপ সংক্ষিপ্ত করবো, তাহলে আগন্তুক দ্রুত বিদায় নিবে। অধিকন্তু সাক্ষাৎকারীদের সাথে আলোচনার সময় এমন কিছু কাজ সেরে নেব যা কথা-বার্তার অন্তরায় নয় এবং কাজগুলোও নিতান্তই জরুরী। যেমন ঃ কাগজ কাটা, খাতা তৈরী (সেলাই) করা, কলম বানানো (সে কালের বাঁশের কলম) ইত্যাদি। তাই আমি মেহমানদের সাথে সাক্ষাতের সময় এ কাজগুলো নিয়ে বসি এবং কথা-বার্তা বলার পাশাপাশি আমার নিত্য প্রয়োজনীয় কাজগুলোও সেরে নেই। যাতে সাক্ষাতের সময়টুকুও আমার অযথা নষ্ট না হয়।

আল্লাহ পাক তাওফিক দিলেই কেবল সম্ভব

ইবনে জাওযী (রঃ) বলেন, আমি এমন বহু লোক দেখেছি যারা জীবনের সঠিক অর্থই বুঝেনি। তারা দিবসের বৃহৎ অংশ বাজারে আড্ডা, গল্প-গুজব, খেলা-ধুলা, রাজা-বাদশাহদের ঘটনা, রাজনৈতিক আলোচনা, সমালোচনা ও পণ্যের দাম উঠা-নামা নিয়ে গল্প করে কাটিয়ে দেয়। তাদের এ সব পাগলামি দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সবাইকে জীবনের মূল্য ও সময়ের গুরুত্ব অনুধাবনের জ্ঞান দান করেন না। যাদেরকে দান করেন কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করা। তাই তো কোরআনে এসেছে–

وَمَا يُلَقّٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

অর্থাৎ, কেবল পরম সৌভাগ্যশীল ব্যক্তিরই এর তাওফিক হয়ে থাকে।

তাই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, যেন তিনি আমাদেরকে জীবনের সঠিক অর্থ বুঝে সময়কে গনীমত মনে করে সঠিক ও সৎকাজে ব্যবহার করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

সময়ের হিফাযতে বুযুর্গানে দ্বীনের ভূমিকা

আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন, আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ অযথা কাল ক্ষেপণ করা থেকে বেঁচে থাকতেন। হযরত ফুজাইল ইবনে ইয়াজ (রঃ) বলেন, আমি এমন লোকদের দেখেছি, যাঁরা এক জুম্‌আ থেকে অন্য জুম্‌আ পর্যন্ত বলা প্রতিটি কথা গণনা করতে পারতেন। অর্থাৎ তাঁরা এতই কম কথা বলতেন, যা হাতে গণার মত।

সালফে-সালেহীনদের কয়েক জন এক বুর্যুগের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। পরিশেষে বিদায় নেয়ার সময় বললেন, হযরত আমরা এসে হয়ত আপনার কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছি। (যেমনটি আমরা সচরাচর বলে থাকি) সে বুযুর্গ উত্তরে বললেন, সত্যিই বলেছো। আমি পড়েতি ছিলাম। কিন্তু তোমাদের আসার কারণে তোমাকে পড়া বন্ধ করতে হয়েছে।

এক আবেদ হযরত সিরী সিক্‌তির (রঃ) নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন তার নিকট এক দল লোক বসে আছে। এ দেখে তিনি বললেন, আপনি তো কর্মহীন বেকার লোকদের স্তুপে পরিণত হয়ে পড়েছেন। এ বলে তিনি রওনা দিলেন। তার নিকট বসলেন না।

একবার কিছু লোক হযরত "মা'রুফ কারখী" (রঃ)-এর দরবারে গেল। যেখানে তারা দীর্ঘ আলোচনায় লিপ্ত হল। ফলে তিনি ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিলেন। কারণ সময়ের চাকা তো অবিরাম ঘুরেই চলছে। তাই এক পর্যায়ে তিনি বলেই ফেললেন, সূর্যের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশ্‌তা সূর্যকে দ্রুত হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ তোমরা এখনও উঠার ইচ্ছা করছোনা।

সময় বাঁচাতে গিয়ে হযরত "দাউদ তয়ী" (রঃ) ছাতু খেতেন। আর বলতেন, ছাতু খাওয়া এবং রুটি বানানোর মাঝে সময়ের পার্থক্য এত বিরাট যে, এর ভেতরে কুরআন শরীফের পঞ্চাশটি আয়াত পাঠ করা যায়।

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

এক বুযুর্গ তার ছাত্রদের উপদেশ দিলেন যে, ক্লাশ শেষে বাড়ী যাওয়ার সময় তোমরা বিক্ষিপ্ত ভাবে যাবে। হতে পারে তোমাদের মাঝে কেউ কোরআন তেলাওয়াত করবে। পক্ষান্তরে যদি তোমারা একত্রে যাও তাহলে অহেতুক গল্প-গুজবে মূল্যবান সময় নষ্ট করবে। ফলে যার কোরআন শরীফ পড়ার ইচ্ছে আছে তার পড়া হবে না।

এ ছিল তাঁদের সচেতনতা।

প্রিয় জীবনের প্রতিটি মুহুর্তকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি

* যথাসাধ্য নির্জনতা অবলম্বন করা।
* মেহমান বা সাক্ষাৎকারীদের সাথে যথা সম্ভব আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা।
* চব্বিশ ঘন্টার রুটিন বানিয়ে সে অনুপাতে কাজ করা।
* পরিমিত আহার করা।
* নিদ্রা কমিয়ে দেয়া।
* অহেতুক কাজ পরিহার করা।
* সব কাজের ঝামেলা নিজ কাঁধে না নিয়ে কিছু কিছু কাজ যোগ্য লোক বিশেষে বন্টন করে দেয়া।

এভাবে নিয়মানুযায়ী সময় অতিবাহিত করলে জীবনের একটি মুহুর্তও নষ্ট হবে না। প্রতিটি মুহুর্ত দ্বীনের কাজে ব্যয় হবে। যদি দ্বীনের কাজে ব্যয় নাও হয় তাহলে অন্ততঃ দুনিয়ার কাজ হলেও হবে। কিন্তু বেকার নষ্ট হবেনা।

পুত্রের প্রতি আল্লামা ইবনে জাওযী (রঃ)-এর উপদেশ

ইমাম ইবনে জাওযী (রঃ) 'লুফতাতুল কাবাদ ফি নসীহাতিল ওয়ালাদ' নামক গ্রন্থে স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন, হে প্রিয় বৎস! ভালো করে বুঝে নাও যে, দিন হল কয়েকটি ঘন্টার সমষ্টি। ঘন্টা মিনিটের সমষ্টি এবং মিনিট কিছু সেকেন্ডের সমষ্টি। প্রতিটি সেকেন্ড এক একটি খালী সিন্ধুকের ন্যায়। খুব খেয়াল রেখো, যাতে কোন একটি সেকেন্ডও লাভ জনক কাজ ব্যতীত অতিবাহিত না হয়। যেন কেয়ামতের দিন খালি সিন্ধুক দেখে লজ্জা পেতে না হয়। তাই তোমার প্রতিটি সেকেন্ডের সিন্ধুককে আমলের মূল্যবান সম্পদ দ্বারা ভরে নাও। জীবনের প্রতিটি মুহুর্তের দিকে খুব সুক্ষ্ম দৃষ্টি রাখবে যে, তা কোন কাজে এবং কোন পথে ব্যয় হচ্ছে। প্রতিটি মুহুর্তে তার উপযোগী উত্তম কাজগুলো সম্পাদন করবে। নিজেকে কর্মহীন ভাবে ছেড়ে দিবে না। কবরের সিন্ধুকে এমন বস্তু প্রেরণ কর যা সে দিন তোমার জন্য আনন্দের বন্যা বয়ে আনবে। আর দূরীভূত করবে সকল গ্লানি।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজীর (রঃ) নিকট সময় ও ইল্‌মের মূল্য

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে আবী উসাইবিয়া তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, আমাকে কাজী শামসুদ্দীন খুরী ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ)- এর উক্তিটি শুনিয়েছেন। ইমাম রাজী (রঃ) বলেন, "আল্লাহর শপথ, আহারের কারণে আমার যে সময়টুকু ইল্‌ম অর্জন ব্যতীত নষ্ট হয় তার জন্য আমি খুবই কষ্ট অনুভব করি। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত খুবই মূল্যবান ও প্রিয়, যার সমকক্ষ পৃথিবীতে আরেকটি নেই।"

ইমাম ইবনে সাকীনার (রঃ) সময়ের হিফাযত

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ইবনে নাজ্জার (রঃ) "তারীখে বাগদাদ" গ্রন্থে ইমাম ইবনে সাকীনা (রঃ) সম্পর্কে লেখেন, তিনি ছিলেন সালফে-সালেহীনদের মধ্যে প্রথম সারির লোক। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইল্‌ম পিপাসুরা তাঁর নিকট এসে তৃষ্ণা নিবারণ করত। তাঁর দরবারে সর্বদা ইল্‌মের চর্চা অব্যাহত থাকতো। তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অত্যন্ত হিফাযত করতেন। কথা-বার্তা নির্দিষ্ট সীমার ভেতরে বলতেন। কোন একটি মুহূর্তও অপ্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় হতে দিতেন না। কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, তাহাজ্জুদ এবং ছাত্রদের শিক্ষাদানে তিনি তাঁর সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি তাঁর মজলিসের লোকদেরকে অপ্রয়োজনীয় কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম ও পর নিন্দা থেকে নিষেধ করতেন। তিনি নামায এবং যা 'না হলে নয়' এমন প্রয়োজনগুলো ব্যতীত কখনও ঘর থেকে বের হতেন না। তিনি কখনও কোন দুনিয়াদারের ঘরে যেতেন না। তাদের আনন্দ-বেদনায় অংশ গ্রহণ করতেন না। তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ইবনে নাজ্জার (রঃ) বলেন, আমি পৃথিবীর বহু জায়গায় সফর করেছি। বড় বড় ওলামা, মাশায়েখ, আবেদ, যাহেদ ও ফকীহ্‌দের দেখেছি। কিন্তু কাউকে তাঁর মত কামেল বলে আমার মনে হয়নি।

ইয়াহইয়া ইবনুল কাশিম (রঃ) বলেন, ইমাম ইবনে সাকীনা (রঃ) একটি মুহূর্তও অযথা ব্যয় করতেন না। আমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি আমাদের উপদেশ দিতেন যে, শুধু আস্‌সালামু আলাইকুম বলেই ক্ষান্ত করবে। কারণ এতেও সময় অপচয় হয়।

সুধী! পাঠক একটু ভেবে দেখুন, কেমন বিস্ময়কর কথা যে, তাঁরা সালামেও সময়ের অপচয় খুঁজে পান! অথচ আমরা সাক্ষাৎ হওয়ার পর কত যে বাজে আলাপে লিপ্ত হই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সবক মুখস্থ করার সর্বোত্তম সময় ও স্থান

খতীবে বাগদাদী (রঃ) তাঁর "আল ফকীহ ওয়াল মোতাফাক্কেহ" গ্রন্থে লেখেন, সবক মুখস্থ করার কিছু উত্তম সময় রয়েছে। মুখস্থকারীদের উচিৎ সে গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা।

* সবক মুখস্থ করার সর্বোত্তম সময় ভোর রাত্র।
* এরপর দিনের প্রথম অংশ তথা সকাল থেকে নিয়ে জোহরের আগ পর্যন্ত।
* এরপর রাত্র।

উল্লেখ্য, রাত্রের মুখস্থ দিনের চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ। পেটে ক্ষুধা থাকা অবস্থায় মুখস্থ করা ভরা পেটে মুখস্থ করার চেয়ে উত্তম। তবে একেবারে অভুক্তাবস্থায় নয়। বরং সামান্য কিছু খেয়ে খিদে কমিয়ে নেয়া উচিৎ। কারণ কোন কোন মানুষ এমনও আছে যে ক্ষুধা সইতে পারে না। চট্‌পট্‌ করতে থাকে। তাই এমতাবস্থায় তদের পড়া মুখস্থ না হওয়াটাই স্বাভাবিক।

এভাবে পড়া মুখস্থ করার জন্য কোলাহল মুক্ত স্থান সর্বোৎকৃষ্ট। এরপর যেখানে গেলে অন্তর স্থীর থাকে। যেখানে অযথা কথা-বার্তা এবং মুখস্থ করার কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নদীর তীরে বা রাস্তার পাশে বসে মুখস্থ করা উচিত নয়। কারণ ওসব জায়গায় অধিকাংশই মন স্থির থাকে না। অথচ মুখস্থ করার জন্য একাগ্রতা একান্তই প্রয়োজন। একাগ্রতার কারণে অন্তর পরিস্কার থাকে। ফলে সঠিক ভাবে চিন্তা-ভাবনা করা এবং সহজে ইল্‌ম অর্জন করা সম্ভব হয়। ছাত্ররা জ্ঞানের দাঁড়ি পাল্লা দ্বারা ইল্‌ম অর্জন করে থাকে। আর এটি এতই সূক্ষ্ম যে, একটু অন্যমনস্ক হলে তা অর্জন করা আর সম্ভব হয় না। এ জন্যই উত্তম সময় ও স্থানের প্রতি সবার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তবেই জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে উত্তম প্রতিদান পাওয়া সম্ভব।

অলসতা ও ঘুম দূর করার পদ্ধতি

ছাত্রদের উচিৎ পড়ার সময় অলসতা ও ঘুম অসলে তা প্রতিহত করা। খাহেশকে প্রশ্রয় দেয়া উচিৎ নয়। পড়ার সময় অলসতা বা তন্দ্রা আসলে তার চিকিৎসা করতে হবে। আর এর অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমন ঃ

* ছাদ বা উন্মুক্ত বাতাসে বের হওয়া।
* এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যাওয়া।
* ঠান্ডা বা গরম পানি দ্বারা হালকা গোসল করা।
* কোন সুস্বাদু পানীয় গ্রহণ বা হালকা নাস্তা করা।
* সহপাঠীর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলাচনা করা।
* কবিতা পাঠ করা।
* উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা।
* বসার ধরণ পরিবর্তন করা।
* কিছুক্ষণ চলা-ফেরা করা।
* উপরে উঠা (বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে)।
* কিতাব বা পুস্তক পরিবর্তন করা।

অলসতা ও তন্দ্রা দূরী করণে উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও নিজ নিজ পরিমন্ডলে আরও বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

মান নির্ণয়

আল্লামা আব্বাস বিন আলভী (রঃ) বলেন, তোমাদের জ্ঞানশক্তি সব ধরণের ইল্‌ম অর্জনে সক্ষম। তাই এই ধারণ ক্ষমতাকে তোমরা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইল্‌ম অর্জনে ব্যবহার কর। তোমাদের ধন-সম্পদ সব ধরণের মানুষ কে ধনী বানাতে সক্ষম নয়; তাই যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের মাঝেই তা বন্টন কর। তোমাদের পক্ষে দুনিয়ার সব মানুষকে সম্মান দেয়া সম্ভব হবে না; তাই যারা সম্মান পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই সম্মান কর। দিন-রাতে সব প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়; তাই কাজ নির্বাচন করে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে প্রাধান্য দাও। যদি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনাকে গুরুত্বহীন কাজে ব্যয় কর তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এমনি ভাবে যখন তোমরা নিজেদের ধন-সম্পদ অবৈধ পথে ব্যয় করবে, তখন সৎ পথে দান করতে পারবে না। যদি অযোগ্য লোকদের সম্মান দেয়ার পেছনে পড় তাহলে যোগ্য ও কামেল লোকদেরকে যথার্থ সম্মান দিতে পারবে না। যদি দিন-রাতকে অপ্রয়োজনীয় কাজে কাটিয়ে দাও তাহলে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তোমাদের হাতে কোন সময় থাকবে না।

আজ যদি আমরা শুনি যে, অমুক আলেম বা অমুক রাইটার শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাহলে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি যে, এ কি করে সম্ভব! হ্যাঁ, যারা সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করে তাদের পক্ষে এটা কোন ব্যাপারই না। বরং এর চেয়ে বড় কিছু হলেও তা তাদের পক্ষে সম্ভব।

সাফল্য অর্জনকারী তালেবে ইল্‌মের গুণাবলী

সময়কে সঠিক ভাবে হিফাযত করা ও সসয় দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তালেবে ইলমের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন।

১। দ্রুত লিখতে পারা।

১. দ্রুত পাঠ করতে পারা।

৩. দ্রুত গতিতে চলা।

দ্রুত লিখন ঃ এতে উস্তাদের পুরো তাক্‌রীর বা লেকচার খাতাবন্ধী করা সম্ভব।

দ্রুত পঠন ঃ এর দ্বারা দ্রুত মুখস্থ করে অন্য কাজ করা যায় এবং বেশী ইলম অর্জন করা যায়।

দ্রুত চলন ঃ এর দ্বারা স্বীয় উস্তাদের নিকট সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হবে।

এসব গুণগুলো এমন যদ্দারা অল্প হায়াতে, সংক্ষিপ্ত সময়ে বিশাল জ্ঞানের ভান্ডার অর্জন করা সম্ভব।

অতীত কভু ফিরে আসবে না।

হযরত আবু গাদ্দাহ (রঃ) বলেন, সময়কে অযথা ব্যয় করা থেকে বাঁচাও। কারণ তা ক্রমশঃ শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর ক্ষয়িত সময় তুমি নতুন ভাবে আবার কাজে লাগাতে পারবেনা। তা কোন দিন তোমার কাছে ফিরে আসবে না। তাই নিজেকে এবং নিজের সময় ও আমলকে সুবিন্যস্ত করে সময় দ্বারা উপকৃত হও। তুমি ছাত্র, শিক্ষক, লেখক, পাঠক, বক্তা, শ্রোতা, তেলাওয়াতকারী, রাত জেগে ইবাদতকারী, যাই

হও সময় নষ্ট করে নিজের মূল্যবান জীবনকে হত্যা করোনা। রত্নতুল্য মুহূর্তগুলোকে অযথা ব্যয় করে নিজের উপর জুলুম করোনা। অলসতা ও বিলাসিতার পেছনে পড়ে ফজিলত ও বুযুর্গির সুমহান মর্যাদা হাত ছাড়া করোনা।

চাই এলেম ও আমলের সমন্বয়

অনেকে মনে করেন শুধু ইবাদত করা, জঙ্গলে চলে যাওয়া, ও ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে বাইরে বাইরে থাকাই সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ কাজ ও জান্নাত লাভের সোপান। আবার অনেকে মনে করেন, শুধু ইল্‌ম চর্চাই সবকিছু। এতেই সব হয়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষে ইল্‌ম ও আমলের সমন্বয় সাধন ব্যতিরেকে শুধু ইল্‌ম বা আমল মূল্যহীন। যখন কারো মধ্যে দু'টির সমন্বয় হবে, তখন সে উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হবে। আর এটাই ইপ্সিত লক্ষ্য ও মানজিলে মাকসাদ।

সময় শ্রেষ্ঠ সম্পদ হওয়ার প্রকৃত কারণ

হযরত হাসানুল বান্নাহ (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সময়ের মূল্য দিতে শিখেছে, সে জীবনের মূল্য দিতে সক্ষম হয়েছে। কারণ মানুষের সময়ই প্রকৃত জীবন। প্রবাদ আছে, 'সময় অমূল্য রতন'। এ প্রবাদটি তাদের কাছে সত্য যারা চিন্তা-চেতনা, জ্ঞান ও উন্নত মনোভাবের অধিকারী। তাদের নিকট সময়ের মর্যাদা অনেক বেশী। তাদের মতে সময়ই হল জীবন। মানুষের চিন্তা করা উচিৎ, এ পৃথিবীতে জীবনই বা কি ? এ তো জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত একটি অবকাশ। সোনা-রূপা-মণি-মুক্তা তো আসা যাওয়া করে। একবার হাত ছাড়া হলে আবার হাতে আসার সম্ভাবনা থাকে। কপাল ভাল হলে পরের বার

পরিমাণে আগের চেয়ে বেশীও আসতে পারে। কিন্তু যে সময় হাত ছাড়া হয়ে যায় তা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। চিন্তা করে দেখুন, বাস্তবিক পক্ষে সময় হিরা-হযরত ও মণি-মুক্তা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান কি না? তবেই বুঝতে পারবেন যে, সময়ই জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যৌবন সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর উক্তি

এ জীবনের একদিন অবসান ঘটবেই। জীবন যে কত গতিময় তা বুঝা বড় দায়। যা চলে যায় তা আর কখনও ফিরে আসে না। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, আমি আমার যৌবন কালকে ঐ বস্তুর মত মনে করি যা কাপড়ের আঁচলে ছিল; পরে হঠাৎ কোথায় যেন পড়ে গেল। যৌবন যদিও দীর্ঘ মনে হয় বাস্তবে তা খুবই সামান্য। এ ভাবে জীবন বহু লম্বা মনে হয়, আসলে এর পরিধি একেবারেই ছোট।

তালেবে ইল্‌মদের প্রতি হযরত থানভী (রঃ)-এর অমূল্য উপদেশ

* ছাত্র জীবনে স্বাস্থ্য ও অবসর সময়কে গনীমত ও সুবর্ণ সুযোগ মনে করে মূল্যায়ন করবে।
* সকল ছাত্রদের বিশেষ করে দ্বীনি ইল্‌ম আহোরণকারীদের সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে বিশেষত কাম ভাবের গুনাহ হতে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। কারণ পাপের দরুন শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষ করে মন-মস্তিষ্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ইল্‌ম অর্জনে ব্যাঘাত ঘটে।

* অন্য ছাত্রের মেধা ও স্মরণ শক্তি নিয়ে কখনও হিংসা করবে না। এতে তোমার কোন ফায়দা তো হবেই না উল্টো ক্ষতি হবে। সর্বদা পেরেশানির গ্লানি বোঝা হয়ে থাকবে। মন বিক্ষিপ্ত থাকবে। ফলে লেখা-পড়ায় মন বস্‌বেনা। এ ছাড়াও হিংসার কারণে নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়।

* যদি কেউ তোমাকে উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে কোন কথা বলেন তাহলে তার আলোচনা শেষ হওয়ার পূর্বে সেখান থেকে উঠবেনা। এতে আলোচনার অবমূল্যায়ন হয় এবং আলোচক মনে কষ্ট পায়।

* তোমার সহপাঠী বা অন্য কেউ যদি পড়া বা লেখায় ভুল করে, তাহলে তুমি এতে হাসবে না। এতে জঘণ্যতম দু'টি অপরাধ হবে। **এক.** তোমার অহংকার প্রকাশ পাবে।

দুই. এক মুসলমান ভাই অন্তরে আঘাত পাবে। আর এ উভয়টিই হারাম।

* কিতাব বা বই পত্র অত্যন্ত আদবের সাথে ধরবে। সাবধান! পা যেন কখনও কিতাব স্পর্শ না করে।

* কিতাবের ইবারত বা রিডিং বিশুদ্ধ ভাবে পড়ার চেষ্টা করবে। অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নোত্তরের পেছনে পড়ে মূল কথা হাত ছাড়া করবে না।

* পড়া ভাল ভাবে মুখস্থ করবে। যাতে অন্তরে দৃঢ় ভাবে বসে যায়। কোন রকম মুখস্থ করে উস্তাদকে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করবে না। এ ধরণের মুখস্থ বেশী দিন থাকে না।

* সবকে বা ক্লাশে কখনও অনুপস্থিত থাকবে না। এতে বরকত উঠে যায়। পেছনের পড়া স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়। লেখা পড়ায় আগ্রহ উদ্দীপনা কমে যায়।

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

* উস্তাদের মর্যাদাবোধ, তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ মোহাব্বত এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। এতে সবক ইয়াদ করার ব্যাপারে তোমার আগ্রহ বাড়বে।

* কথা বা কাজে ভুল হয়ে গেলে সাথে সাথে নিজের ভুল স্বীকার করে নিবে।

* তুমি বড় আলেম বা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে গেলেও নীচের দিকের (ওয়ান-টু-এর) উস্তাদকেও উস্তাদই মনে করবে। বরং বড় উস্তাদের চাইতে তাকে বেশী সম্মান করা উচিৎ। কারণ তিনিই তোমার জন্য বেশী কষ্ট করেছেন। তাঁর প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতাই যোগ্যতা ও বিনয়ের পরিচয়।

* ক্লাশ চলাকালীন উস্তাদের সামনে হাসা-হাসি বা এমন কোন আচরণ করবে না যাতে উস্তাদের মনে আঘাত লাগে।

* ইল্ম নিয়ে কখনও গর্ব করবে না, বরং আল্লাহর দান ও নেয়ামত জ্ঞান করে শুকরিয়া আদায় করবে।

* সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখবে। এতে সমস্ত জিনিষ তোমার অনুকূলে এসে যাবে। অন্যথায় সব কিছু তোমার প্রতিকূলে চলে যাবে। আল্লাহ্ সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন।

আমীন

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) উম্মতে মুহাম্মাদীর এমন এক ব্যক্তিত্ব যাঁর আলোচনায় মানসলোকে ও মনোরাজ্যে মুহাব্বতের হিল্লোল বয়ে যায়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) দ্বিতীয় শতকের বুযুর্গদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবে কেমন যেন তিনি ঐ সময়কার বুযুর্গ; যখন থেকে হুজুরের (সাঃ) তিরোধানের ব্যবধান মাত্র এক বৎসর। তিনি ইমাম বুখারীর (রঃ) পূর্ব পুরুষ। তিনি হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ)-এর সমকালীন ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর সুযোগ্য শাগরেদও ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) ১১৮ হিজরীতে খোরাসান শহরের 'মারব' নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি বাগদাদের অধিবাসী হন এবং বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) এর জীবনের গতি পরিবর্তনের বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত শাহ্ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রঃ) তার 'বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থে ঘটনাটি এ ভাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ)-এর অনেক বড় একটি আপেলের বাগান ছিল। তিনি ছিলেন স্বাধীন চেতা। না ছিল ইলমের সাথে কোন সম্পর্ক, আর না দ্বীনের সাথে। মদের আড্ডা ও গান-বাজনার মধ্যেই কেটে যেত তার দিন-রাত। একবার আপেলের মৌসুমে তিনি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে নিজেদের বাগানে চলে গেলেন। উদ্দেশ্য আপেল খাওয়া ও আমোদ-প্রমোদ করা। তাই তিনি সেখানে দিন কাটাতে লাগলেন। এ

দিকে বাগানে বন্ধু-বান্ধবদের জন্য গান বাজনার বিরাট আয়োজন করা হল। পাশাপাশি মদ পানের ব্যবস্থাও রাখা হল। উল্লেখ্য, তিনি বাদ্যযন্ত্র নিপুনতার সাথে বাজাতে জানতেন এবং উচ্চ পর্যায়ের একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। এ দিকে মদের নেশা আর বাদ্যের তালে তিনি এক সময় নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েন। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে দেখেন তার বাদ্য যন্ত্রটি তার কোলে পড়ে আছে। তখন তিনি পুনরায় বাদ্য যন্ত্র বাজাতে চাইলেন। কিন্তু ঐশী ইশারায় যন্ত্রটি কিছুতেই বাজলোনা। কোন আওয়াজই আসলোনা। তখন তিনি সেটি ঠিক করে পুনরায় বাজাতে চাইলেন। কিন্তু এতেও কাজ হল না। ব্যর্থ হয়ে আবার মেরামত করলেন এবং বাজাতে চাইলেন। কিন্তু এবার সে যন্ত্র থেকে সঙ্গীতের আওয়াজের পরিবর্তে কোরআনে কারীমের এ আয়াতটি ধ্বনিত হতে লাগল–

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ –

অর্থ,এখনও কি ঈমানদারদের জন্য সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর সমূহ নম্র হয়ে যাবে ? এবং আল্লাহ তায়ালা যে চির সত্য বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তার জন্য তাদের অন্তর সমূহ বিনয়ী হবে।

এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, এই আওয়াজ বাদ্যযন্ত্র হতে এসেছিল। অবশ্য অন্য এক রেওয়ায়েতে দেখা যায়, তিনি যে স্থানে বসা ছিলেন তার নিকটে একটি গাছে একটি পাখী বসা ছিল; সে পাখীর মুখ থেকে এ আওয়াজ বেরিয়ে ছিল। কিন্তু কথা হল এ ধ্বনি যে সিঁড়িই ডিঙ্গিয়ে আসুক না কেন এর উৎস যে আল্লাহ তায়ালা; তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ছিল তাঁকে হিদায়েতের আলোকরশ্মী দান করা।

ঐশী এ অনুরণন আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ)-এর অন্তরে রেখাপাত করল। হৃদয়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে হঠাৎ বিজলী চমকে উঠল। তখন তিনি বলে উঠলেন, হায় ! এ পর্যন্ত আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে কোন কাজে ব্যয় করেছি। এরপর

بلى يارب قد آن - بلى يا رب قد آن

অর্থাৎ ,হে প্রভু! আর দেরী নয়। এক্ষুণি আমি আমার সকল ব্যস্ততা এড়িয়ে তোমার দিকে মনোনিবেশ করছি।

বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন পৃঃ- ১৫৫

সেখান থেকে ফিরে এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ) জ্ঞানার্জনে এমন ভাবে ব্যাপৃত হন যে, পরবর্তীতে তিনি একজন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দীস, বুযুর্গ এবং পরবর্তী জাতির জন্য একজন রাহ্‌বার হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত অমর হয়ে থাকেন।

হযরত ইসমাঈল ইবনে আব্বাস তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ আমি পৃথিবীর বুকে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রঃ)-এর মত কোন লোক দেখিনি এবং তাঁর মত উত্তম চরিত্রের অধিকারী করে তাঁর যুগে আল্লাহ তায়ালা অন্য কাউকে সৃষ্টি করেছেন বলে আমার জানা নেই। বড় বড় মাশায়েখে কেরামগণও তাঁর সাহচর্যে থেকে ধন্য হয়েছেন।

তিনি তাঁর জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করে অতিবাহিত করতেন। তিনি এক বৎসর হজ্ব করতেন। দ্বিতীয় বৎসর জিহাদের ময়দানে কাটাতেন এবং তৃতীয় বৎসর ব্যবসা করতেন। ব্যবসায় তিনি যে লাভ করতেন তা গরীব মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন।

তিনি এক বার এক স্থান দিয়ে যাচ্ছিলেন, লোকেরা তাঁকে আসতে দেখে এক অন্ধ ব্যক্তি কে বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আসছেন, তোমার কিছু চাওয়ার থাকলে তাঁর নিকট চেয়ে নাও। যখন তিনি অন্ধের একেবারে কাছাকাছি এলেন, তখন অন্ধ দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট দোয়ার দরখাস্ত করল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তার জন্য দোয়া করলেন। অন্ধ লোকটি সাথে সাথে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেল। এই মহামনীষী ১৮১ হিজরীতে ইহলীলা সাঙ্গ করে আল্লাহ সান্নিধ্যে চলে যান।

সমাপ্ত